
টুনটুনি ও ছোটাচ্চু
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশে বইমেলা ২০১৪
প্রকাশকাল একুশে বইমেলা ২০১৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সাদাতউদ্দিন আহ্‌মেদ এমিল

ISBN : 978-984-495-116-7

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হাসান জায়েদী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : সৃজনী, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৫০.০০

Tuntuni O Chotacchu by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Hassan Zaidi, Pearl Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published February 2014, Price 250 Tk. Only
e-mail pearl_publications@yahoo.com

উৎসর্গ

"কান পেতে রই"-এর স্বেচ্ছাসেবকদের

(তোমরা কিছু তরুণ তরুণী মিলে নিঃসঙ্গ, বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্তদের মানসিক সেবা দেবার জন্যে একটি হেল্প লাইন খুলেছ। এমনকি আত্মহত্যা করতে উদ্যত কেউ কেউ শেষ মুহূর্তে তোমাদের ফোন করেছিল বলে তোমরা তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ। আমি আমার সুদীর্ঘ জীবনে কখনো কারো জীবন বাঁচাতে পারিনি কিন্তু তোমরা এই বয়সেই মানুষের জীবন বাঁচাতে পার—কী আশ্চর্য!)



বাসাটা তিনতলা। কিংবা কে জানে, চারতলাও হতে পারে। আবার তিন কিংবা চারতলা না হয়ে সাড়ে তিনতলাও হতে পারে। এই বাসায় যারা থাকে, তাদের জন্য অসম্ভব কিছু না। এই বাসায় কারা থাকে, সেটা বলে দিতে পারলে মনে হয় ভালো হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া বলে লাভ কী, সবার নাম, বয়স, কে কী করে—এত সব কি আর মনে রাখা সম্ভব? শুধু একটা জিনিস বলে দেওয়া যায়, এই বাসার সবাই একই পরিবারের মানুষ। সংখ্যাটা শুধু আন্দাজ করা যেতে পারে, ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন হবে—কিংবা কে জানে, বেশিও হতে পারে। বাসাভর্তি বাচ্চা কিলবিল করছে। এতগুলো বাচ্চার হিসাব রাখা কঠিন, তাদের বাবা-মায়েরাই হিসাব রাখতে পারে না।

বাবা-মায়েরা যে হিসাব রাখতে পারে না তার অবশ্য একটা কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে, তারা কে কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। হয়তো বাসায় খেতে বসেছে, ডাইনিং টেবিলে খাবারটা কারও পছন্দ হলো না, সাথে সাথে নাক কুঁচকে থালাটা বগলে নিয়ে ওপরে কিংবা পাশের ফ্ল্যাটে চলে যাবে। হয়তো স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে স্কুলের পোশাক খুঁজে পাচ্ছে না, তখন তারা অন্যজনের ফ্ল্যাটে গিয়ে অন্য কারও পোশাক পরে ফেলবে। কাছাকাছি বয়স সমস্যা হয় না। বড়জোর একটু ঢলঢলে কিংবা একটু টাইট হয়, সেটা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। রাতে ঘুমানোর সময় মায়েরা যদি দেখে বাচ্চা বিছানায় নেই, তাহলেও তারা দুশ্চিন্তা করে না। আবার যদি দেখে দুই-চারটা বাচ্চা বেশি, তাহলেও অবাক হয় না।

এই পরিবারের বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া মাঝবয়সী মানুষও আছেন, আবার বুড়ো মানুষও আছেন। বুড়ো মানুষ অবশ্যি মাত্র একজন, তাঁর নাম জোবেদা খানম। জোবেদা খানমকে অবশ্য তাঁর নাম দিয়ে ডাকার কেউ নেই, তাই জোবেদা খানমও তাঁর নিজের নামটা প্রায় ভুলেই গেছেন। বাচ্চাকাচ্চারা তাঁকে নানি না হয় দাদি ডাকে। কেউ যেন মনে না করে যাদের নানি ডাকার

কথা তারা নানি ডাকে, আর যাদের দাদি ডাকার কথা তারা দাদি ডাকে! যখন যার যেটা ইচ্ছে, তখন তারা সেটা ডাকে। কেউ সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না, নানি কিংবা দাদি না ডেকে যদি খালা কিংবা আপু ডাকত, তাহলেও কেউ মনে হয় মাথা ঘামাত না।

জোবেদা খানমের বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে, সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকেন। সব পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হলে তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এখানে কেউ যায়নি। ওপরতলা কিংবা নিচতলায় থেকে গেছে। সবারই বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে, শুধু একজন ছাড়া। সে ঘোষণা দিয়েছে যে সে বিয়ে করবে না। সেই ঘোষণা শোনার পর সবারই ধারণা হয়েছে, তার নিশ্চয়ই বিয়ে করার শখ হয়েছে। যাদের বিয়ে করার শখ হয়, তারা এ রকম ঘোষণা দেয়। একদিন সে বাসায় এসে বলল, "গুড নিউজ।"

সে প্রায় প্রত্যেকদিনই বাসায় এসে এ রকম কিছু একটা বলে, তাই কেউ তার কথার কোনো গুরুত্ব দিল না। দাদি চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনতে থাকলেন, বাচ্চাকাচ্চারা ফোর টোয়েন্টি খেলতে থাকল, বড় ভাই পত্রিকা পড়তে থাকল আর ভাবি টেবিলে খাবার রাখতে থাকল।

তখন সে আবার গলা উঁচিয়ে বলল, "গুড নিউজ। পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে। আমি পাস করেছি।"

বড় ভাই পত্রিকা থেকে চোখ না তুলে বলল, "কী পরীক্ষা?"

ছেলেটা বলল, "মাস্টার্স।"

বড় ভাই পত্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, বলল, "মাস্টার্স? আমি ভেবেছিলাম তুই ইন্টারমিডিয়েটে পড়িস।"

ছোট ভাই রাগ হয়ে বলল, "ভাইয়া, তুমি কোনো কিছু খোঁজ রাখো না। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, সেইটা তুমি জানো না?"

"জানতাম মনে হয়, ভুলে গেছি।"

ভাবি ডাইনিং টেবিলে শব্দ করে একটা প্লেট রেখে বলল, "সব সময় এক কথা, ভুলে গেছি। জিজ্ঞেস করে দেখো তার কয়টা ছেলেমেয়ে, সেটা মনে আছে কি না। সেটাও মনে হয় ভুলে গেছে।"

বড় ভাই তখন আবার পত্রিকায় মুখ ঢেকে ফেলল, একবার এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সব সময় সে বিপদে পড়ে যায়।

মেঝেতে বসে যে বাচ্চাকাচ্চা ফোর টোয়েন্টি খেলছিল তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "ছোটাচ্চু, তুমি কি গোল্ডেন ফাইভ পেয়েছ?"

তার আসল নাম শাহরিয়ার কিন্তু বাচ্চারা কেউ সেটা জানে বলে মনে হয় না। চাচাদের মধ্যে সে ছোট, তাই তাকে ছোট চাচা ডাকা হয়। যাদের সে ছোট মামা তারাও তাকে ছোট চাচা ডাকে। ছোট চাচা শব্দটা ছোট হতে হতে ছোটাচ্চু হয়েছে, আরও ছোট হবে কি না কেউ জানে না।

ছোটাচ্চু বলল, "ইউনিভার্সিটিতে গোল্ডেন ফাইভ হয় না।"

"তাহলে কী হয়?"

বাচ্চাদের মধ্যে যে একটু ত্যাঁদড় টাইপের সে বলল, "প্লাস্টিক ফাইভ!"

সব বাচ্চা তখন হি হি করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, "প্লাস্টিক ফাইভ, প্লাস্টিক ফাইভ!"

ছোটাচ্চু চোখ পাকিয়ে বলল, "খবরদার ফাজলামি করবি না। দেব একটা থাবড়া।"

ছোটাচ্চু কখনো থাবড়া দেয় না, মেজাজ গরম করে না, তাই তাকে কেউ ভয় পায় না। সত্যি কথা বলতে কি, ছোটাচ্চুকে বাচ্চারা তাদের নিজেদের বয়সী মনে করে, তাই তাদের সব রকম ফুর্তি-ফার্তা, হাসি-তামাশা সবকিছু ছোটাচ্চুকে নিয়ে। বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে যে একটু বড়, সে বলল, "তোমার গ্রেড কত, ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চুর চেহারাটা প্রথমে একটু কঠিন হলো, তারপর কেমন যেন দার্শনিকের মতো হলো, তারপর বলল, "ইউনিভার্সিটির ডিগ্রিটা হচ্ছে বড় কথা। গ্রেড দিয়ে কী হবে? পাস করেছি, সেইটা হচ্ছে ইম্পরট্যান্ট।"

ত্যাঁদড় টাইপের বাচ্চাটা বলল, "তার মানে তোমার গ্রেড কুফা?"

ছোটাচ্চু আবার চোখ পাকিয়ে বলল, "মোটেও কুফা না।"

"তাহলে কত, বলো।"

ছোটাচ্চু ঠিক করে দিল, "টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স।"

বাচ্চাটা চোখ কপালে তুলে বলল, "মাত্র টু?"

"টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স।"

"একই কথা। তার মানে তুমি প্রায় ফেল করে গিয়েছিলে। অল্পের জন্য বেঁচে গেছ।"

ছোটাচ্চু বলল, "মনে নেই, পরীক্ষার আগে আমার ডেঙ্গু হলো?"

দাদি অবাক হয়ে বলল, "তোর ডেঙ্গু হয়েছিল নাকি? কখন?"

"ওই যে জ্বর হলো। নিশ্চয়ই সেটা ডেঙ্গু ছিল।"

বাচ্চাদের ভেতর ত্যাঁদড়জন জিজ্ঞেস করল, "প্লাটিলেট কাউন্ট কত ছিল ছোটাচ্চু?"

"ব্লাড টেস্ট করাইনি।"

"তাহলে বুঝলে কেমন করে ডেঙ্গু?"

"ডেঙ্গু ছাড়া আর কী হবে? সবার তখন ডেঙ্গু হচ্ছিল, মনে নাই?"

ত্যাঁদড়জন বলল, "আসলে তোমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তো সেই জন্য তুমি বানিয়ে বানিয়ে ডেঙ্গুর কথা বলছ।"

সব বাচ্চাকাচ্চা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, একজন বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি তো লেখাপড়া করো নাই, সেই জন্য তোমার রেজাল্ট খারাপ হয়েছে।" তারা লেখাপড়া করে না, সে জন্য সব সময় বকুনি শুনতে হয়। এখন ছোটাচ্চুকে লেখাপড়া না করার জন্য ধরা যাচ্ছে, এ রকম সুযোগ খুব বেশি আসে না। তাই তারা সবাই সুযোগটার সদ্ব্যবহার শুরু করল, বলা শুরু করল:

"প্রতিদিন নিয়ম করে পড়তে হয়। সকালে আর রাতে।"

"নো টিভি। টিভি দেখলে ব্রেন নষ্ট হয়ে যায়।"

"পড়ার সময় মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। উল্টাপাল্টা চিন্তা করলে হবে না।"

"বই মুখস্থ করে ফেলবে।"

"সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে, তুমি তো দশটার আগে ওঠো না।"

"আউল ফাউল বই পড়ে লাভ নেই। পাঠ্যবই ঝাড়া মুখস্থ, দাঁড়ি-কমাসহ।"

ছোটাচ্চু তখন সবাইকে একটা ধমক দিল, "চুপ করবি তোরা? বেশি মাতবর হয়েছিস?"

ত্যাঁদড় টাইপ বলল, "তোমরা বললে দোষ নাই, আর আমরা বললে দোষ।"

"লাই দিতে দিতে মাথায় উঠে গেছিস।"

একজনের জানার ইচ্ছে হচ্ছিল লাই জিনিসটা কী, সেটা কেমন করে দেওয়া হয়, সেটা কি হাত দিয়ে ধরা যায়, পকেটে রাখা যায়, কিন্তু ছোটাচ্চুর মেজাজ দেখে আর জিজ্ঞেস করার সাহস করল না।

দাদি বললেন, "পাস করেছিস, এখন চাকরি-বাকরি করবি?"

ত্যাঁদড় টাইপ বলল, "টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স দিয়ে কোনো চাকরি হবে না।"

ছোটাচ্চু চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর দার্শনিকের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি চাকরি করতে চাই না। চাকরি মানেই আরেকজনের গোলামি। স্বাধীনভাবে কাজ করব।"

বড় ভাই পত্রিকা সরিয়ে মুখ বের করে বলল, "আমরা যে চাকরি করি, সেটা কি গোলামি?"

ছোটাচ্চু বলল, "তোমার কথা আলাদা। তুমি বস। তোমার আন্ডারে যারা কাজ করে, তাদের কথা বলছি।"

"সব সময় নিচ থেকে শুরু করে ওপরে উঠতে হয়।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "নেভার। আমি ওপর থেকে শুরু করব।"

"ওপর থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিচে নামবি?"

ছোটাচ্চু নার্ভাসভাবে হাসার চেষ্টা করল, বলল, "না, ওপর থেকে শুরু করে ওপরেই থেকে যাব। একটা ফার্ম দেব।"

বাচ্চাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "কিসের ফার্ম? মুরগির?"

অন্য একজন বলল, "হ্যাঁ। সব সময় মুরগির ফার্ম হয়। মুরগি ছাড়া আর কোনোকিছুর ফার্ম হয় না। মুরগি আর মোরগ। তার সাথে বেবি মোরগ।"

আরেকজন শুদ্ধ করে দিল, "তার সাথে ডিম। তাই না ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু বলল, "নেভার। আমি কেন মুরগির ফার্ম দেব?"

"তাহলে কিসের ফার্ম?"

"কোনো একধরনের সার্ভিস ফার্ম, যেখানে ইনভেস্টমেন্ট লাগে না।"

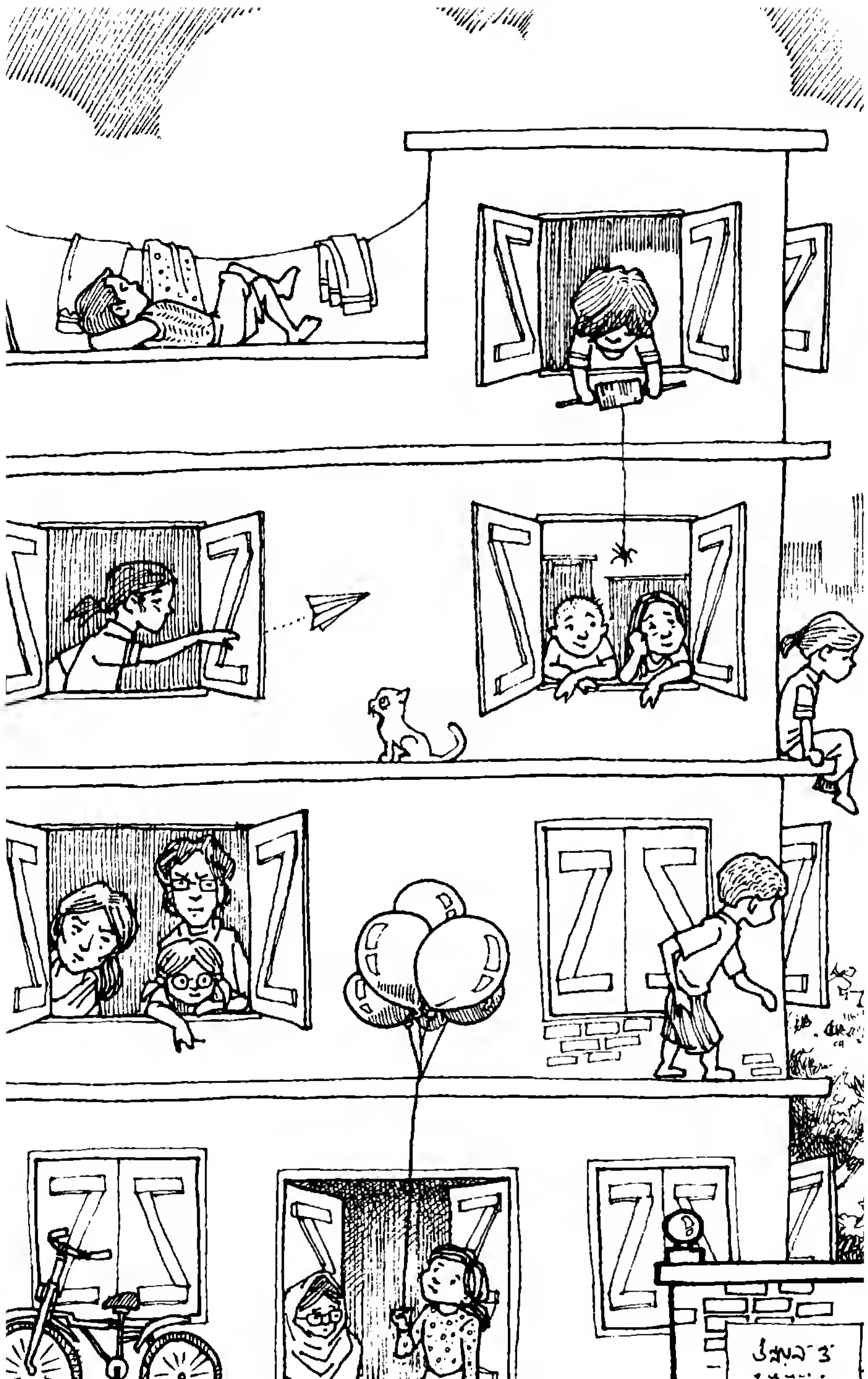
বাচ্চাদের একজন জিজ্ঞেস করল, "ইনভেস্টমেন্ট মানে কী?"

ত্যাঁদড় টাইপ বুঝিয়ে দিল, "টাকাপয়সা। ছোটাচ্চু কোনো টাকাপয়সা খরচ না করে টাকাপয়সা কামাই করবে। তাই না ছোটাচ্চু?"

"ছোটলোকের মতো শুধু টাকাপয়সা টাকাপয়সা করবি না। সার্ভিস ফার্ম খুব ইম্পরট্যান্ট কনসেপ্ট। সারা পৃথিবী এখন সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে চলছে। কত রকম সার্ভিস আছে দুনিয়াতে জানিস? আমাকে একটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"সেটা কী সার্ভিস ছোটাচ্চু?"

"এখনো ঠিক করি নাই। বিষয়টা নিয়ে আগে গবেষণা করতে হবে।" ছোটাচ্চু তখন মনে হয় তখন তখনই গবেষণা করতে বের হয়ে গেল। বড় ভাই পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশে রেখে দাদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার এই ছেলের কপালে দুঃখ আছে।"



দাদি কিছু বললেন না, উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে লাগলেন।

বড় ভাই বলল, "এ রকম লাফাংরা আর নিষ্কর্মা মানুষ আমি জন্মে দেখি নাই। বাবাও কাজের মানুষ ছিল, তুমিও কাজের মানুষ, তোমাদের ছেলে এই রকম নিষ্কর্মা হলো কেমন করে?"

বাচ্চারা তখন একসাথে আপত্তি করল, "না, বড় মামা। ছোটাচ্চু মোটেও নিষ্কর্মা না।" যদিও বড় ভাই অনেকের বড় চাচা, আবার অনেকের বড় মামা। তার পরও সবাই তাকে বড় মামা বলে। নিজের ছেলেমেয়েরাও ভুলে মাঝেমধ্যে তাকে বড় মামা ডেকে ফেলে। একজন বলল, "মনে নাই, আমরা যখন নাটক করেছিলাম তখন ছোটাচ্চু স্টেজ বানিয়ে দিয়েছিল।"

"আর ওই ছাগলের বাচ্চাটাকে যখন গোলাপি রং করেছিলাম, তখন ছোটাচ্চু রং এনে দিয়েছিল।"

"আর ওই রাজাকার টাইপ মানুষটাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল মনে নাই?"

"আর আমরা যে সিনেমা বানালাম, সেইখানে ছোটাচ্চু ভিলেনের অ্যাকটিং করল।"

"আর ভাইয়ার স্কুল থেকে যখন গার্ডিয়ানকে ডেকে পাঠাল...

সে বাক্যটা শেষ করতে পারল না, এর আগেই তাকে অন্যরা থামিয়ে দিল। স্কুলে অপকর্ম করার জন্য যখন গার্ডিয়ানকে ডেকে পাঠায়, তখন মাঝেমধ্যেই ছোটাচ্চু গার্ডিয়ান সেজে তাদের উদ্ধার করে, যেটা বাবা মায়েরা অনেকেই জানে না এবং জানার কথা না।

বড় মামা একটা বই টেনে নিয়ে পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে বলল, "তোমাদের ছোটাচ্চুর কাজকর্ম ওই পর্যন্তই। ছাগলকে গোলাপি রং করা, শরীরে কালি মেখে ভূতের ভয় দেখানো। যদি এই রকম সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি থাকে তাহলে তার কোনো চিন্তা নাই।"

দাদি বলল, "আহা। ছোট মানুষ, থাকুক না ছোট মানুষের মতো।"

"আমার তাতে আপত্তি নাই। শাহরিয়ারের কাজকর্ম দেখে তো আমি তাই ভেবেছিলাম, সে বুঝি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। আসলে মাস্টার্স পাস করে ফেলেছে, এখন তো শাহরিয়ার রীতিমতো বড় মানুষ।"

বাচ্চারা আপত্তি করে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, তারা কেউ চায় না তাদের ছোটাচ্চু বড় মানুষ হয়ে যাক।

পরের কয়েকদিন ছোটাচ্চুকে গভীর মনোযোগ দিয়ে বইপত্র ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখা গেল। শুধু তাই না, একটা ছোট নোটবইয়ে তাকে কী সব লিখতে দেখা গেল। বাচ্চারা কখনো তাদের ছোটাচ্চুকে এ রকম গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে দেখেনি তাই তারা বেশ অবাক হয়ে গেল। যখন ছোটাচ্চু আশপাশে থাকে না তখন তারা সেই নোটবই খুলে দেখার চেষ্টা করল সেখানে কী লেখা, কিন্তু তারা কিছু বুঝতে পারল না। ইনভেস্টিগেশন, ক্রাইম সিন, মোটিভ, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন—বাংলা ইংরেজিতে এই রকম কঠিন কঠিন শব্দ লেখা যেগুলো পড়ে তারা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।

সপ্তাহ খানেক পর ছোটাচ্চু প্রথম বাচ্চাদের সামনে তার পরিকল্পনাটা খুলে বলল। একদিন সবাইকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়ে সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি কী কী সার্ভিস ফার্ম দিব সেইটা ঠিক করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক করে শুরু না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এইটা সিক্রেট। ঠিক আছে?"

সবাই মাথা নাড়ল, যদিও মনে মনে সাথে সাথে কাকে কীভাবে এটা বলবে সেটা চিন্তা করতে লাগল।

ছোটাচ্চু তার মুখটা আরও গম্ভীর করে বলল, "আমি যেটা খুলব সেটা হচ্ছে একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি। নাম দেওয়া হবে—দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।"

বাচ্চারা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। শুধু ছোটাচ্চুই এ রকম অসাধারণ আইডিয়া নিয়ে আসতে পারে। সবাই হাত তুলে চিৎকার করতে থাকল, "আমি আমি আমি...

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "আমি কী?"

"আমিও হব।"

"তুই কী হবি?"

"ডিটেকটিভ।"

ছোটাচ্চুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "তোরা কি ভেবেছিস এটা একটা খেলা? তোরা সবাই মিলে সেই খেলা খেলবি?"

সবাই চুপ করে রইল। তারা ধরেই নিয়েছিল এটা ছাগল রং করার মতো একটা মজার ব্যাপার, ঠিক খেলা না হলেও খেলার মতোই আনন্দের। সবাই মিলে সেটা করবে।

ছোটাচ্চু মুখ আরও গম্ভীর করে বলল, "এটা মোটেও ঠাট্টা-তামাশা না, এটা খুবই সিরিয়াস। এটা বড়দের বিষয়, প্রফেশনালদের বিষয়। এটা নিয়ে লেখাপড়া করতে হয়, গবেষণা করতে হয়।" ছোটাচ্চু হলুদ রঙের একটা বই দেখিয়ে বলল, "এই যে একটা বই, এখানে অনেক কিছু লেখা আছে। কীভাবে ডিটেকটিভের কাজ করতে হয় সবকিছু বলে দেওয়া আছে। এমনকি যদি মঙ্গল গ্রহ থেকে কোনো প্রাণী চলে আসে, তাহলে কী করতে হবে, সেটা পর্যন্ত লেখা আছে।"

একজন বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"কী করতে হবে?"

ছোটাচ্চু বলল, "সেইটা জেনে তুই কী করবি?"

"যদি কখনো দেখা হয়ে যায়।"

ছোটাচ্চু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "দেখা হলে আমার কাছে নিয়ে আসবি।"

"কিন্তু—"

ছোটাচ্চু থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন চুপ কর দেখি। ফালতু কথা না বলে যেটা বলছি সেটা শোন।"

সবাই তখন আবার চুপ করল। ছোটাচ্চু বলল, "আমি তোদের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ বড়দের সাথে আলোচনা করে কোনো লাভ নাই। তারা কিছু বোঝে না। তোরা বুঝবি।"

বাচ্চাকাচ্চারা সবাই মাথা নাড়ল, এটা সত্যি কথা। বড়রা কিছুই বুঝে না। যেটা বুঝে সেটা উল্টাপাল্টাভাবে বুঝে। না বুঝলেই ভালো। ছোটাচ্চু বলল, "আমি এর মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। এই যে এইগুলো কিনে এনেছি।" ছোটাচ্চু তার ব্যাকপ্যাক খুলে প্রথমে একটা বড় ম্যাগনিফাইং গ্লাস, একটা বাইনোকুলার আর একটা মোটা কলম বের করে আনল।

একজন জিজ্ঞেস করল, "মোটা কলম দিয়ে কী করবে?"

ছোটাচ্চুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "দেখে মনে হচ্ছে কলম। আসলে এটা একটা ভিডিও ক্যামেরা। বুকপকেটে রেখে কথা বলবি, তখন সবকিছু ভিডিও হয়ে যাবে!"

বাচ্চাদের মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল।

হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলল, "দেখি দেখি।"

ছোটাচ্চু বলল, "এটা বাচ্চাদের জিনিস না।"

বাচ্চারা হাতে নিতে না পেরে যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল।

ছোটাচ্চু বলল, "আরও জিনিস অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো এলেই দেখবি।"

ত্যাঁদড় ধরনের বাচ্চাটা জিজ্ঞেস করল, "তোমার অফিস কোনটা হবে? তোমার রুম? সেইটা যদি অফিস হয় তাহলে তুমি ঘুমাবে কোথায়?"

"শুরুতে হবে ভার্চুয়াল অফিস।"

"ভার্চুয়াল অফিস? সেটা আবার কী?"

"ভার্চুয়াল অফিস মানে হচ্ছে সব কাজকর্ম, যোগাযোগ হবে ইন্টারনেটে। একটা ওয়েবসাইট থাকবে, সেখানে সবাই যোগাযোগ করবে। যদি দেখি কোনোটা ভালো, তাহলে ক্লায়েন্টের সাথে নিউট্রাল গ্রাউন্ডে...

ছোটাচ্চুকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে একজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি রিভলবার কিনবে না? না হলে পিস্তল। সব সময় ডিটেকটিভদের পিস্তল, না হলে রিভলবার থাকে।" যে জিজ্ঞেস করল সে এই বাসায় সবচেয়ে নিরীহ ধরনের ছোট একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে।

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে বলল, "রিভলবার?"

"হ্যাঁ। আমি সিনেমায় দেখেছি ডিটেকটিভরা গুলি করে সব সময় মগজ বের করে দেয়। তুমি কি গুলি করে মগজ বের করবে?"

ছোটাচ্চু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তোদের আমি বিষয়টা বোঝাতেই পারলাম না। এটা মোটেও নাটক-সিনেমা না। এটা গল্প-উপন্যাস না। এটা সত্যিকারের সার্ভিস। বাংলাদেশে এখনো নাই, আমি প্রথম শুরু করতে যাচ্ছি। সিনেমাতে ডিটেকটিভদের রিভলবার-পিস্তল থাকে। আমার সেগুলো লাগবে না। আমার দরকার খালি বুদ্ধি।"

ত্যাঁদড় মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বুদ্ধি আছে?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "যেকোনো মানুষ থেকে বেশি। খালি বুদ্ধি না, আমার আছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণী মস্তিষ্ক এবং নিরলস পরিশ্রম করার আগ্রহ।"

এই রকম কঠিন কঠিন কথাগুলোর অর্থ কী বাচ্চাদের বেশির ভাগই বুঝতে পারল না। তারা অবশ্যি সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। একজন জিজ্ঞেস করল, "আমাদের নেবে না?"

"আঠারো বছরের কম কাউকে নেওয়া যাবে না।"

হাসিখুশি ধরনের একজন বলল, "আমি আর টুম্পা দুইজন মিলে আঠারো।"

"দুইজন মিলে আঠারো হলে হবে না। একজনকে আঠারো হতে হবে।"

যখন তারা বুঝতে পারল ছোটাচ্চু তাদের নেবে না, তখন তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে শুরু করল। তারা যখন উঠে চলে যেতে শুরু করল, ছোটাচ্চু তখন আবার সবাইকে মনে করিয়ে দিল, "মনে থাকবে তো? এটা এখনো সিক্রেট। কাউকে বলা যাবে না।"

সবাই মাথা নাড়ল এবং একটু পরেই তারা অন্যদের ছোটাচ্চুর ডিটেকটিভ এজেন্সির কথা বলতে লাগল। তারা কথা বলল ফিসফিস করে আর বলার আগে কিরা কসম খাইয়ে নিল যেন কথাটা অন্য কাউকে না বলে। দাদি জানতে পারলেন পনেরো মিনিটের মধ্যে। শুনে মুখ টিপে হাসলেন। বড়মামা জানতে পারলেন রাত্রে ঘুমানোর আগে। শুনে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "এই শাহরিয়ারটা আর কোনোদিন বড় হল না!"



ছোটাচ্চু তার ঘরে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে হলুদ বইটা পড়ছে, তার চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই ছোট একটা নোটবইয়ে কিছু একটা লিখছে। এ রকম সময়ে টুনি এসে ঘরে ঢুকল।

এই বাসার অসংখ্য বাচ্চার সবার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু মনে হয় টুনির কথা আলাদা করে বলে রাখা ভালো। টুনির বয়স এগারো, ছোটখাটো সাইজ, তাই দেখে মনে হয় বয়স বুঝি আরও কম। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার মুখের দিকে তাকালে সবাই ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়, সেখানে এমন এক ধরনের গাম্ভীর্য আছে যে দেখে মনে হয় সে বুঝি বয়স্ক একজন মানুষ। এই বাসার বাচ্চাকাচ্চাদের লেখাপড়ায় বেশি আগ্রহ নাই তাই তাদের কারও চোখে চশমা নাই—টুনি ছাড়া। তার চশমাটি মোটেও বাচ্চাদের চশমা নয়, চশমার দোকান থেকে বেছে বেছে সে বুড়ো মানুষের গোল গোল মেটাল ফ্রেমের চশমা কিনেছে, সেই চশমায় তাকে আরও বয়স্ক দেখায়। সে কথা বলে কম, যখন বলে তখন অল্প দুই-চারটা শব্দ দিয়ে সবকিছু বলে ফেলে। যখন কথা বলে না তখন ঠোঁট দুটি চেপে রাখে, যেন মুখের ভেতর থেকে তার অজান্তে কোনো কথা বের না হয়ে যায়। টুনির চুলগুলো অনেকটা পুতুলের চুলের মতো, মাথার দুই পাশে দুটি ঝুঁটি এবং সেগুলো লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা।

ছোটাচ্চুর ঘরে ঢুকে টুনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে কিছু জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত সে কোনো কথা বলে না। ছোটাচ্চু তার হলুদ বইয়ে এত বেশি ডুবে ছিল যে প্রথমে টুনিকে লক্ষই করেনি। যখন লক্ষ করল তখন মুখ তুলে বলল, "টুনটুনি!"

মন মেজাজ ভালো থাকলে ছোটাচ্চু মাঝে মাঝেই টুনিকে টুনটুনি ডাকে কিন্তু টুনির নাম যেহেতু টুনটুনি না, তাই তাকে টুনটুনি ডাকা হলে সে সাধারণত উত্তর দেয় না। এবারও সে উত্তর দিল না। তার গোল গোল

চশমার ভেতর দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু তখন একটু থতমত খেয়ে বলল, "কিছু বলবি?"

টুনি মাথা নেড়ে জানাল যে, সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু কিছু না বলে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছোটাচ্চু তখন বলল, "কী বলবি? বল।"

টুনি কম কথার মানুষ, তাই সে কম কথায় বলল, "আমিও ডিটেকটিভ হব।"

ছোটাচ্চু একটু হকচকিয়ে গেল, বলল, "কী হবি?"

টুনি উত্তর দিল না, সে কী বলেছে ছোটাচ্চু ভালো করে শুনেছে, তাই আরও একবার একই কথা বলার কোনো অর্থ নেই। সে কখনো বাড়তি কথা বলে না।

ছোটাচ্চু তখন বলল, "তুই ডিটেকটিভ হবি? ডিটেকটিভ হওয়া এত সোজা!"

টুনি বলল, "তুমি যদি হতে পারো এটা নিশ্চয় সোজা।"

ছোটাচ্চু কেমন জানি চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল, "কী বললি, কী বললি তুই?"

টুনি কোনো কথা বলল না, তার হিসাবে ছোটাচ্চুর এই কথাটার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। সে যে কথাটা বলেছে সেটা না বোঝার কোনো কারণ নাই। ছোটাচ্চু তখন গলা উঁচিয়ে বলল, "তোরা ভেবেছিস কী? আমি একটা খেলা খেলছি? ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ খেলা?"

টুনি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল, বুঝিয়ে দিল যে সে এটাকে খেলা ভাবছে না।

ছোটাচ্চু আরও গলা উঁচিয়ে বলল, "তাহলে? তাহলে তুই ডিটেকটিভ হবি এই কথাটার মানে কী?"

টুনি বলল, "সব ডিটেকটিভের একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে। আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হব।"

ছোটাচ্চুর মুখটা কেমন জানি অল্প হাঁ হয়ে গেল, সেই হাঁ অবস্থায় বলল, "অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

টুনি মাথা নাড়ল। ছোটাচ্চু তখন ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মনে কর আমি তোকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানালাম। তারপর মনে কর একটা ক্লায়েন্ট আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে এল, এসে দেখল আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে আট বছরের একটা বাচ্চা—"



টুনি গম্ভীর গলায় বলল, "আমার বয়স মোটেও আট বছর না।"

"কত? তোর বয়স কত? নয়? বড়জোর দশ?"

"আমার বয়স এগারো বছর তিন মাস।"

"ঠিক আছে। তোর বয়স এগারো বছর তিন মাস। আট বছর আর এগারো বছর তিন মাসের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে? নাই। যদি আমার কোনো ক্লায়েন্ট এসে দেখে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের বয়স এগারো বছর তিন মাস তাহলে আমাকে সিরিয়াসলি নেবে? নেবে সিরিয়াসলি?"

টুনি কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছোটাচ্চু তখন ফোঁস করে আরেকটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "শোন টুনি। তোদের নিয়ে আমি অনেক কিছু করি। নাটক করি, ছাগল রং করি। ভূতের ভয় দেখাই। সেগুলো হচ্ছে মজা। সেগুলো হচ্ছে খেলা। কিন্তু এটা খেলা না। আমার ডিটেকটিভ এজেন্সি মোটেও খেলা না। এটা সিরিয়াস বিজনেস। এটা বাচ্চাকাচ্চার বিষয় না। এটা হচ্ছে বড়দের ব্যাপার। বুঝেছিস?"

টুনি মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে। ছোটাচ্চু তখন হাসি হাসি মুখ করে বলল, "গুড।"

টুনি বলল, "আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

ছোটাচ্চু এবার রীতিমতো চমকে উঠে বলল, "কী বললি? তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট? এতক্ষণ ধরে আমি তাহলে কী বললাম?"

টুনি গলায় এখন আরও জোর দিয়ে বলল, "তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

ছোটাচ্চু রেগে উঠে বলল, "তোকে কে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়েছে? আমি বানিয়েছি?"

টুনি খুব শান্ত গলায় বলল, "ছোটাচ্চু। তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি ঠিক করে চালানোর জন্য ভালো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। আমি হচ্ছি সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট। তোমাকে এখন কোনো বেতন দিতে হবে না। আমি ফ্রি তোমাকে সব কাজ করে দেব।"

ছোটাচ্চু আরও রেগে উঠল, "আমার সাথে ঠাট্টা করছিস? রং-তামাশা করছিস?"

টুনি বলল, "তুমি শুধু শুধু রাগ করছ ছোটাচ্চু। সত্যিকারের ডিটেকটিভরা কখনো রাগ হয় না। তুমি এখনো আসল ডিটেকটিভ হও

নাই। সেই জন্য তোমার একজন ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। আমি হচ্ছি সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

ছোটাচ্চু কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু টুনি সেটা শুনতে দাঁড়াল না, হেঁটে হেঁটে চলে গেল।

পরের কয়েকটা দিন ছোটাচ্চুর জন্য মোটেও ভালো গেল না। তার এক নম্বর কারণ, এই বাসার যার সাথেই তার দেখা হলো সে-ই তাকে একই প্রশ্ন করতে লাগল। প্রথমে দাদি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই! তুই নাকি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছিস আর টুনি নাকি তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি কিন্তু টুনি মোটেও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট না।"

"তাহলে সবাই যে বলছে তুই নাকি টুনিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়েছিস। বাচ্চা একটা মানুষ—"

"আমি টুনিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাই নাই। যে বলেছে সে ভুল বলেছে।"

দাদি উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে বুনতে বললেন, "সেটাই ভালো। বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে টানাটানি কেন? আর ডিটেকটিভ এজেন্সি জিনিসটা কী? কী করবি সেখানে? এটা কি কোনো ধরনের খেলা?"

ছোটাচ্চুর মুখ আরও শক্ত হয়ে গেল। বলল, "এটা মোটেও খেলা না। এটা সিরিয়াস বিজনেস। মানুষজন প্রবলেম নিয়ে আসবে, আমি সেই প্রবলেম সলভ করে দেব।"

দাদি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "জানি না বাপু। তুই তোর নিজের প্রবলেমই সলভ করতে পারিস না, মানুষের প্রবলেম সলভ করবি কেমন করে?"

ছোটাচ্চু ফোঁস করে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি খালি দেখো। আগেই এত নেগেটিভ হয়ে যেয়ো না।"

বড় মামার সাথে যখন দেখা হলো তখন বড় মামা বলল, "তুই নাকি প্রাইভেট ডিটেকটিভ আর টুনি নাকি তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

ছোটাচ্চু গম্ভীর গলায় বলল, "আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হওয়ার চেষ্টা করছি। সেই জন্য একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি। রেজিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি।"

"টুনিকে নিলে তোর রেজিস্ট্রেশন হবে?"

"আমি টুনিকে নেই নাই।"

বড় মামা একটু অবাক হয়ে বলল, "তাহলে সবাই যে বলছে—"

"কে বলছে?"

"তোর ভাবি বলল। টুম্পা বলল। শান্ত বলল। প্রমি বলল।"

টুম্পা, শান্ত, প্রমি এরা এই বাসার বিভিন্ন চরিত্র, এদের সবার নাম মনে রাখা সোজা নয়, দরকারও নেই। ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "সবাই তোমাকে ভুল বলেছে। আমি মোটেও টুনিকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাই নাই।"

বড় মামা একটু অবাক হয়ে বলল, "ও।"

ঠিক তখন ভাবি ঘরে এসে ঢুকল, ছোটাচ্চুকে দেখে বলল, "এই যে তোমাকে খুঁজছিলাম। তুমি নাকি—"

ভাবি কথা শেষ করার আগেই ছোটাচ্চু বলল, "না।"

ভাবি অবাক হয়ে বলল, "কী না?"

"তুমি যেটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছ।"

"আমি কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি?"

"টুনি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট কি না।"

ভাবি আরও অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে বুঝলে আমি এটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছি। কে কী বলবে সেটা আমার অনুমান করতে হয়।"

"তাই বলে টুনির মতো ছোট একটা বাচ্চাকে তোমার সাথে নেবে?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মোটেও টুনিকে নিচ্ছি না।"

"তাহলে সবাই যে বলছে—"

ছোটাচ্চু হিংস্র গলায় বলল, "কে বলছে?"

"ওই তো রনি, পিকু, টুশি, শায়লা—"

রনি, পিকু, টুশি, শায়লা—এরা এই বাসার মানুষজন। এদের নামও মনে রাখা সম্ভব না। দরকারও নেই।

ছোটাচ্চু মুখ আরও শক্ত করে বলল, "সবাই মিলে পেয়েছে কী? আমি সবগুলোকে খুন করে ফেলব।"

ভাবি হেসে বলল, "তুমি ডিটেকটিভ মানুষ, নিজেই যদি খুন করে ফেলো, তাহলে কেমন করে হবে? অন্যরা খুন করবে, তুমি সেটা বের করবে। বইয়ে তো সে রকমই লেখে।" কথা শেষ করে ভাবি টেনে টেনে আরও কিছুক্ষণ হাসল।

ছোটাচ্চু বলল, "ভাবি তুমি এভাবে হাসবে না। এটা মোটেও ঠাট্টার বিষয় না।"

কিছুক্ষণের মাঝে অনেকগুলো বাচ্চা ছোটাচ্চুকে ঘিরে ফেলল, তারা সবাই এক সাথে কথা বলতে লাগল। কথাগুলো ছিল এ রকম—যদিও সবাই এক সাথে কথা বলার কারণে কেউ কিছু শুনতে পারছিল না, বুঝতেও পারছিল না।

একজন বলল, "তুমি বলেছিলে এটা ছোটদের জন্য না, তাহলে টুনিকে কেন নিলে? আমাকে কেন নিলে না?"

আরেকজন বলল, "টুনি কি ছোট না? টুনি আমার থেকে ছোট।"

অন্যরা বলল

"টুনি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট? কেন? কেন? কেন?"

"তোমার সাথে আমরা কোনোদিন খেলব না। তুমি টুনিকে নিলে আর আমরা এত করে বললাম আমাদের নিলে না।"

"অন্যায়। অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়।"

"মানি না। মানি না।"

"ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

"জ্বালো জ্বালো। আগুন জ্বালো।"

ছোটাচ্চু যদিও কারও কথাই স্পষ্ট করে শুনতে পারছিল না, তবু বুঝে গেল সবাই কী নিয়ে কথা বলছে। সে চিৎকার করে বলল, "চোপ। সবাই চোপ। এক্কেবারে চোপ।"

একজন মিনমিন করে বলল, "চোপ বলে কোনো শব্দ নাই। শব্দটা হচ্ছে চুপ।"

আরেকজন বলল, "চুপ থেকে পাওয়ারফুল হচ্ছে চোপ। তাই না ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু তাদের কারও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "আমি তোদের সবাইকে খুব স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে চাই। আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি মোটেও পোলাপানের খেলা না। এটা বড় মানুষদের

দিয়ে তৈরি বড় মানুষের সমস্যা সমাধানের একটা সিরিয়াস এজেন্সি। এখানে কোনো বাচ্চাকে নেওয়া হয় নাই। টুনিকেও নেওয়ার প্রশ্নই আসে না।"

একজন বলল, "তাহলে টুনি যে বলল সে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

"সে মোটেও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট না। ডাক টুনিকে।"

টুনিকে ডাকতে হলো না, ঠিক তখন দেখা গেল টুনি তার স্টিলের তৈরি গোল গোল চশমা চোখে হেঁটে হেঁটে আসছে। মুখে একেবারে ঘন মেঘ কিংবা কংক্রিটের দেয়ালের মতো গাম্ভীর্য। ছোটাচ্চু হুংকার দিল, "টু-নি।"

টুনি দাঁড়িয়ে গিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, "কোনো কথা বলল না, বলা প্রয়োজন মনে করল না। ছোটাচ্চু আরও জোরে হুংকার দিয়ে বলল, "তুই নাকি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছিস যে তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

টুনি না-সূচকভাবে মাথা নাড়ল। ছোটাচ্চু তখন তার গলা আরও এক ধাপ ওপরে তুলে বলল, "সবাই বলছে তুই এটা বলেছিস—"

টুনি প্রথমবার মুখ খুলল, বলল, "আমি সবাইকে বলেছি, তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে কখনো তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাতে পারবে না। এটা চালাতে হলে আমাকে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাতে হবে।"

ছোটাচ্চু চিৎকার করে বলল, "কী বললি? কী বললি তুই?"

টুনি কোনো উত্তর না দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। ছোটাচ্চু আরও জোরে চিৎকার করে বলল, "দেখলি, টুনির সাহসটা দেখলি তোরা? সে নিজেকে ভেবেছে কী? মাদাম কুরি নাকি হাইপেশিয়া?"

বাচ্চাকাচ্চারা মাদাম কুরিকে চেনে না, হাইপেশিয়া কি মানুষ না একটা রোগের নাম, সেটাও ধরতে পারল না। শুধু অনুমান করল ছোটাচ্চু খুব রেগেছে। তবে ছোটাচ্চুর রাগ নিয়ে বাচ্চাকাচ্চারা বেশি মাথা ঘামায় না। তাই তারা এবারও এটা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করল না।

তবে মজার ব্যাপার হলো, এক সপ্তাহের মাঝে সবাই আবিষ্কার করল টুনির কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি!



জোবেদা খানম তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে যে তিনতলা কিংবা চারতলা (যেটা আসলে সাড়ে তিনতলাও হতে পারে) বাসায় থাকেন, তার কাছাকাছি একটা একতলা বাসা আছে। একতলা বাসা বলে কেউ যেন সেটাকে তাচ্ছিল্য না করে, তার কারণ সেই বাসা দেখলে যে কেউ ট্যারা হয়ে যাবে। তবে বাসাটা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বলে কেউ বাসাটা দেখতে পায় না, তাই কেউ এখনো ট্যারা হয়ে যায়নি। বাসাটা অনেক জায়গাজুড়ে, মনে হয় তিন-চারটা ফুটবল মাঠের সমান। বাসার সামনে-পেছনেও অনেক জায়গা, সেটাও মনে হয় পাঁচ-ছয়টা ফুটবল মাঠের সমান। বাসার ভেতরে নানা রকম গাছ। বাসার কাছাকাছি যাবার জন্যে কংক্রিটের রাস্তা, যেকোনো সময় সেখানে তিন-চারটা দামি দামি গাড়ি থাকে। বাসার সামনে ফুলের বাগানে সারা বছর নানা রকম ফুল ফুটে থাকে, কিন্তু সেগুলো কেউ দেখতে পায় না। তার কারণ কেউ বাসার ভেতরে ঢুকতে পারে না। বাসার সামনে যে বিশাল গেট সেখানে পাহাড়ের মতো একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে। গেট দিয়ে কেউ ভেতরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলেই সেই দারোয়ান হুংকার দিয়ে বলে, "খ-ব-র-দা-র!"

সেই বাসার মালিকের নাম হাজি গুলজার খান। স্থানীয় লোকজন বলে গুলজার খান একসময় অনেক বড় গুণ্ডা ছিল, চুরি-ডাকাতি-খুন করে বিশাল সম্পত্তি তৈরি করেছে, তারপর হজ্ব করে এসে সে এখন ভালো মানুষ হয়ে গেছে। তার স্ত্রী কতজন, ছেলেমেয়ে কতজন, তারা কে কী করে, কে কোথায় থাকে সেগুলো কেউ ভালো করে জানে না, তবে সবাই একদিন খবর পেল হাজি গুলজার খানের মেয়ের বিয়ে। সেই বিয়ের আয়োজন দেখে সবার তাক লেগে গেল। বিয়ে উপলক্ষে কত কী যে হলো তার কোনো হিসাব নাই। আর এই বিয়ের কারণে এই এলাকার মানুষজন প্রথমবার হাজি গুলজার খানের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারল। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তার বাসায় একেক দিন একেক আয়োজন, শুধু তাই না, প্রথমবার এলাকার মানুষজনের জন্যে গেট খুলে দেয়া হয়েছে। রাতের বেলা কোনোদিন

কনসার্ট, কোনোদিন সার্কাস, কোনোদিন যাত্রাগান আর সারাদিন ধরে মেলা। এলাকার লোকজন সুযোগ পেয়ে সবাই ভিড় করে সেগুলো দেখতে গেল। জোবেদা খানমের নাতি-নাতনিরাও তখন প্রথমবার হাজি গুলজার খানের বাড়ির ভেতরে ঢোকার সুযোগ পেল। তারা তাদের বাসার চার দেয়ালের মাঝখানে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু বাসার বাইরে গেলে তাদের কঠিন নিয়ম মানতে হয়। সন্ধ্যাবেলার মাঝে তাদের সবার বাসায় ফিরে আসতে হয়। মাগরিবের আজানের পর কেউ বাইরে থাকতে পারে না। তাই হাজি গুলজার খানের বাড়িতে তারা শুধু মেলাটাই দেখতে পেল, রাত্রের আয়োজন কনসার্ট, সার্কাস, থিয়েটার বা যাত্রা দেখার সুযোগ পেল না।

মেলাটা অবশ্য বাচ্চাকাচ্চারা বেশি পছন্দ করল। সেখানে নানা রকম জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, তার মাঝে এক কোনায় মৃত্যুকূপ। সেখানে একজন খাড়া দেয়ালে মোটরসাইকেল চালায়। এ ছাড়া আছে নাগরদোলা, সেটাতে ওঠার সময় ঠিক আছে, নামার সময় পেটের মাঝে কেমন জানি চাপ লাগে, সেই চাপের জন্যে কী না কে জানে, সবাই তখন একে অন্যের ওপর বমি করে দিল—নাগরদোলায় চড়ার থেকে বেশি আনন্দ হলো সেটা নিয়ে। এ ছাড়া ছিল সাপের খেলা। বেদেনিরা মোটা মোটা সাপ ধরে এনেছে, সুর করে গান গেয়ে তারা সেই সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। বাচ্চাকাচ্চাদের ধারণা ছিল, সাপ বুঝি ভেজা ভেজা তেলতেলে কিন্তু সেটা সত্যি নয়। বেদেনিদের বললেই তারা গলায় সাপ ঝুলিয়ে দেয়, তখন তারা আবিষ্কার করল সাপের শরীর আসলে শুকনো আর খসখসে।

সাপের খেলার চেয়েও মজার খেলা হলো বানরের খেলা। শুকনো টিংটিংয়ে একটা মহাচালবাজ বানর নানা রকম খেলা দেখিয়ে গেল। বিয়ে করতে যাওয়া, শ্বশুরকে সালাম করা, শাশুড়িকে ভেংচি কাটা, বউয়ের সাথে তামাশা করা, পাবলিকের পকেট কাটা, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজত খাটা, জেলখানায় বাথরুম পরিষ্কার করা এবং সবার শেষে জেল থেকে বের হয়ে বড় মাস্তান হয়ে যাওয়া! এই পর্যায়ে টিংটিংয়ে শুকনো বানরটা তার ওস্তাদের কাছ থেকে একটা মোবাইল ফোন নিয়ে সেটা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করল, ছবি তুলল আর সেটা দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেলো। শুধু টুনি হাসল না, বলল, "এইটা স্মার্টফোন। স্মার্টফোন দিয়ে কেউ এইভাবে ছবি তোলে না। কেউ এইভাবে ফোন করে না।"

বাচ্চাদের একজন বলল, "টুনি! এইটা মানুষ না। এইটা বানর।"

টুনি বলল, "বানর হয়েছে তো কী হয়েছে? ঠিকভাবে ব্যবহার করা শিখবে না? ফোনটা কত দামি দেখেছ?"

কেউ সেটা দেখেনি, দেখার দরকারও মনে করেনি। সবাই জানে টুনির সবকিছু নিয়ে সব সময়ই বাড়াবাড়ি।

হাজি গুলজার খানের মেয়ের বিয়ে নিয়ে নানা রকম আয়োজন, মনে হয় সারা দেশ থেকে লোকজন এসেছে, সেটা নিয়েও একটা ঝামেলা হলো। ঝামেলাটা অবশ্য বড় মানুষের সাথে বড় মানুষের, ছোটদের সেটা জানার কথা না বোঝার কথা না, কিন্তু তবু তারা না দেখার এবং না বোঝার ভান করে অনেক কিছু বুঝে গেল। বিয়ে উপলক্ষে কাজ করার জন্য হাজি গুলজার খানের বাড়িতে গ্রাম থেকে অনেক মানুষ আনা হয়েছে, তাদের মাঝে পুরুষ আছে, মহিলা আছে, কম বয়সী কিছু মেয়েও আছে। এই রকম একজন কম বয়সী মেয়ে হঠাৎ করে হাজি গুলজার খানের বাসা থেকে বের হয়ে সোজা জোবেদা খানমের কাছে এসে তার পা ধরে হাউমাউ করে কান্না শুরু করল। নানি বললেন, "কী হয়েছে মেয়ে? তুমি কাঁদো কেন?"

মেয়েটা বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান।"

নানি বললেন, "তোমার কী হয়েছে না জানলে আমি কেমন করে বাঁচাব?"

মেয়েটা তখন চোখ মুছে আশপাশে তাকাল, বাচ্চারা তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরো বিষয়টা দেখছে। মেয়েটার মুখ দেখে বোঝা গেল সে বাচ্চাকাচ্চাদের সামনে কিছু বলতে চাইছে না। নানি তখন বাচ্চাদের বললেন, "এই তোরা এখান থেকে যা।"

ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটা বলল, "কেন? আমরা থাকলে কী হবে?"

নানি বললেন, "তোরা থাকলে আমি তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

নানির কথা শুনে মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতেই ফিক করে হেসে দিল, তখন সবাই বুঝতে পারল মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর এবং এখন কান্নাকাটি করলেও আসলে বেশ হাসিখুশি।

নানি ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর ঘরের ভেতরে কী নিয়ে কথা হলো বাচ্চারা কিছু জানতে পারল না। কিন্তু দেখা গেল মেয়েটা যখন ঘর থেকে বের হয়েছে, তখন তার মুখে ঝলমলে হাসি। সে কোমরের মাঝে শাড়ি পেঁচিয়ে তখন তখনই রান্নাঘরে ঢুকে বাসন ধুতে শুরু করল। বাচ্চারা

বুঝতে পারল, এই বাসায় মেয়েটার চাকরি হয়েছে, মেয়েটার কিছু একটা বিপদ ছিল, নানির কাছে চাকরি পেয়ে মেয়েটার সেই বিপদ কেটে গেছে। মেয়েটার নাম ঝুমু, বাচ্চারা তাকে ঝুমু খালা বলে ডাকতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মাঝেই টের পেল ঝুমু খালা নামের মেয়েটা খুব মজার।

ঠিক কী জন্য মেয়েটা হাজি গুলজার খানের বাসা থেকে পালিয়ে নানির কাছে এসেছে, বিষয়টা জানার জন্য বাচ্চাদের সবারই খুব কৌতূহল। আশপাশে যখন কেউ নেই তখন ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটা ঝুমু খালার কাছ থেকে সেটা বের করার চেষ্টা করল, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল "আচ্ছা ঝুমু খালা, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

ঝুমু খালা রান্নাঘরে একটা ডেকচি সাংঘাতিকভাবে ডলাডলি করছিল, ডলাডলি না থামিয়েই বলল, "করো।"

"গুলজার খানের বাড়িতে তোমার কী সমস্যা হয়েছিল?"

ঝুমু খালা ডেকচিটা পানিতে ধুতে ধুতে বলল, "শুনতে চাও?"

ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"ভয় পাবা না তো?"

"না। ভয় পাব কেন?"

"শোনো তাহলে—" বলে ঝুমু খালা হাজি গুলজার খানের বাসাটার একটা ভয়ংকর বর্ণনা দিল। বাসাটা বাইরে থেকে চকচকে মনে হলেও ভেতরে অন্ধকার গুহার মতো। সেখানে ছোট-বড়-মাঝারি ভূত এবং ভূতের বাচ্চারা ঘোরাঘুরি করে। রাতের বেলা সেই ভূতের একটা বাচ্চা ঝুমু খালার পায়ের বুড়ো আঙুলে কামড়ে ধরেছিল, ঝুমু খালা তখন রুটি বেলার বেলুনি দিয়ে পিটিয়ে সেটাকে আধমরা করে ফেলেছিল। (গল্পের এই অংশে ঝুমু খালা ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটাকে তার পায়ের বুড়ো আঙুলটা দেখাল, সত্যি সত্যি সেখানে ছাল উঠে আছে।) ভূতটা আধমরা হওয়ার পর ঝুমু খালা সেটাকে একটা জেলির খালি বোতলে ভরে আটকে রেখেছে। সেটাকে উদ্ধার করার জন্য প্রতি রাতে ছোট-বড়-মাঝারি ভূত এবং ভূতের বাচ্চারা এসে হামলা করে। ভূতের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে ঝুমু খালা সেই বাড়ি ছেড়ে নানির কাছে চলে এসেছে।

ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটা হাঁ করে ঝুমু খালার দিকে তাকিয়ে রইল, একজন মানুষ যে এ রকম আজগুবি একটা গল্প এ রকম বিশ্বাসযোগ্য করে বলতে পারে, সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না। আমতা আমতা করে বলল, "ভূতের বাচ্চাটা এখনো জেলির বোতলে আছে?"

ঝুমু খালা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আছে।"

"আমাকে দেখাবা?"

"দিনের বেলা তো দেখানো যায় না। রাতে দেখতে হয়।"

"রাতে দেখাবা?"

ঝুমু খালা তখন চিন্তিত মুখ করে বলল, "দেখি! তোমরা ছোট পোলাপান। ভয় পেয়ে প্যান্টে পিশাব করে দিলে ঝামেলা।"

ত্যাঁদড় টাইপের ছেলেটা মুখ কালো করে ফিরে এল, সে যথেষ্ট বড় হয়েছে, এই বয়সে সে প্যান্টে পেশাব করে দেবে সে জন্য তাকে ভূতের বাচ্চা দেখানো যাবে না, বিষয়টা তার পক্ষে হজম করা খুব কঠিন।

দেখা গেল ঝুমু খালা যে শুধু বানিয়ে বানিয়ে ভয়ংকর আজগুবি গল্প বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলতে পারে তা না, এলাচি-দারুচিনি দিয়ে পায়েসের মতো একধরনের চা বানাতে পারে, খুব অল্প তেল দিয়ে অসাধারণ পরোটা বানাতে পারে, লাল মরিচ দিয়ে ঝাল করে চ্যাপা শুঁটকির ভর্তা বানাতে পারে। তার সবচেয়ে বড় প্রতিভা হচ্ছে স্বপ্নের অর্থ বলে দেওয়া—হাতি স্বপ্ন দেখলে কী হয়, জাহাজ স্বপ্ন দেখলে কী হয়, এমনকি তেঁতুলগাছে বাদুড় বসে আছে স্বপ্ন দেখলে কী হয়, সেটাও বলে দিতে পারে। ছোট বাচ্চাকাচ্চারা তাকে খুব পছন্দ করল, বড়রা আগে বাচ্চাদের দিয়ে যে কাজগুলো করাতে পারেনি, ঝুমু খালা প্রথম চব্বিশ ঘণ্টার মাঝেই সেটা করিয়ে ফেলল। নানি (কিংবা দাদি) জোবেদা খানমও তাকে খুব পছন্দ করলেন, কারণ দিনের কাজ শেষ করে ঝুমু খালা নানির পায়ের কাছে বসে তার পায়ে ঝাঁজালো সরিষার তেল মাখিয়ে মালিশ করতে করতে টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখতে লাগল এবং সিরিয়ালের বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচনা করতে লাগল। সমালোচনাগুলো বেশির ভাগই নানির সাথে মিলে গেল বলে নানি খুব খুশি।

ঝুমু খালা নানির কাছে মাত্র এক সপ্তাহ থাকার অনুমতি চেয়েছিল। এর মাঝে বাড়ি থেকে লোক এসে তাকে নিয়ে যাবে। সবাই মিলে ঝুমু খালাকে হয়তো পাকাপাকিভাবে রেখেই দিত কিন্তু একদিন পরেই তাকে বিদায় করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে হলো, তার কারণ ঝুমু খালা যেদিন এসেছে, সেদিনই বড় মামার মানিব্যাগ, মেজো চাচির এক জোড়া কানের দুল আর ছোট খালার একটা মোবাইল ফোন চুরি হয়ে গেল। এই বাসায় বাইরের কোনো মানুষ

আসে না, কাজেই কোনো কিছু চুরি হলে বাসার ভেতরের কাউকেই চুরি করতে হবে। মানুষটা ঝুমু খালা ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না—শুধু সে-ই এই বাসার নতুন মানুষ।

চুরির খবরটা শোনার পর বাসার সবার খুব মন খারাপ হলো। এ রকম কমবয়সী হাসিখুশি একজন মেয়ে দেখে বোঝাই যায় না তার এ রকম একটা অভ্যাস রয়েছে, সেটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন।

যখন ঝুমু খালা আশপাশে নেই তখন বড় মামা বলল, "এত চমৎকার মসলা চা বানায় অথচ চুরির অভ্যাসটা ছাড়তে পারল না।"

মেজো চাচির এক জোড়া কানের দুল গিয়েছে, তাই তার খুব মেজাজ খারাপ। মেজো চাচি বলল, "একে তো বিদায় করেই দিতে হবে। কিন্তু বিদায় করার আগে আমার কানের দুল জোড়া উদ্ধার করে দেবে না?"

মেজো চাচা মাথা চুলকে বলল, "কেমন করে?"

"জিনিসপত্র সার্চ করলেই বের হয়ে যাবে।"

বড় মামা বলল, "শুধু সন্দেহের বশে একজনের জিনিসপত্র সার্চ করা যায় না। এতে মানুষকে অসম্মান করা হয়।"

"অসম্মান?" মেজো চাচি বলল, "যে চুরি করতে পারে তাকে সম্মান করতে হবে?"

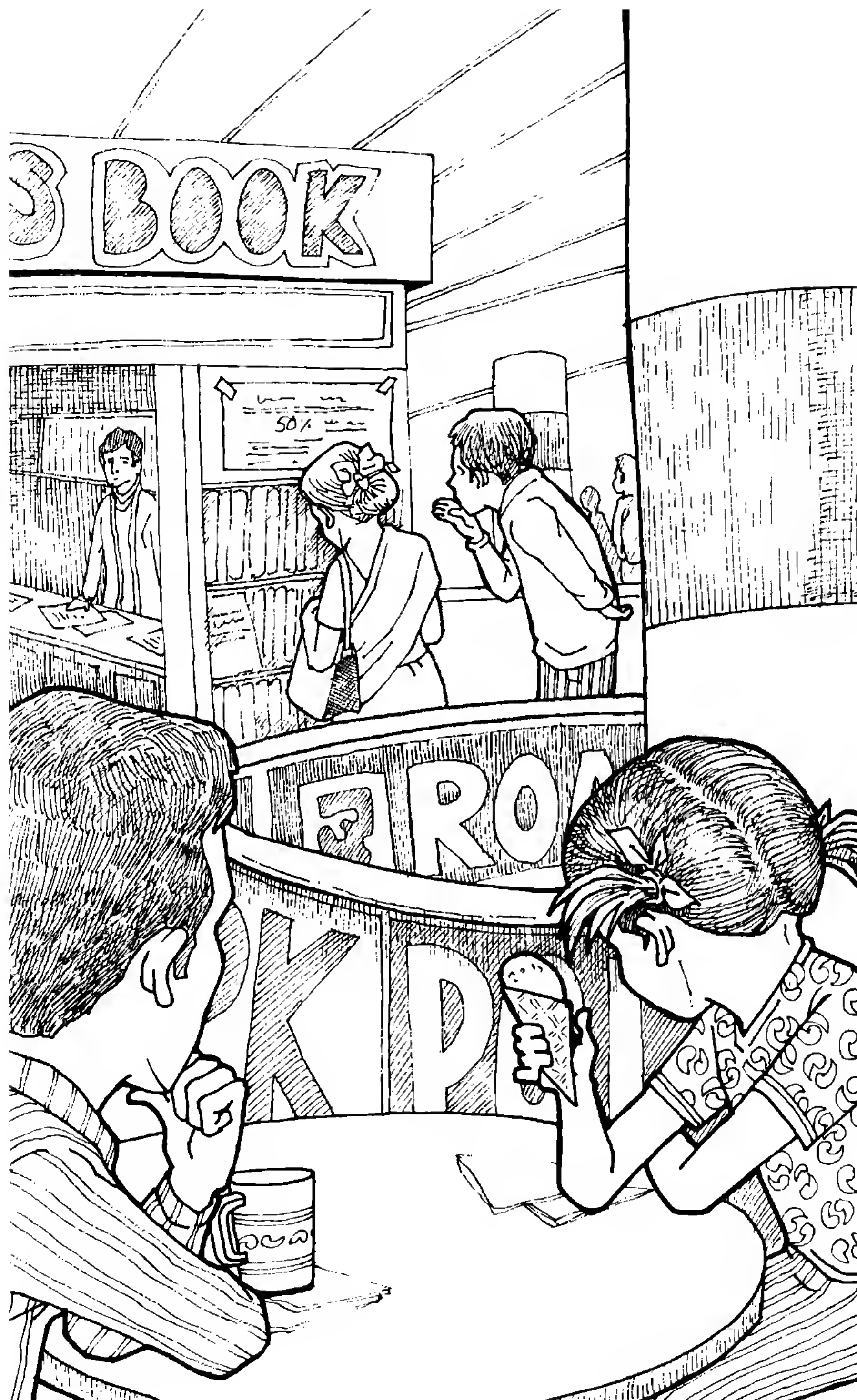
বড় মামা দার্শনিকের মতো একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সবাইকে সব সময় সম্মান করতে হয়। তা ছাড়া আমরা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না যে ঝুমুই চুরি করেছে।"

"আর কে করবে? জানালার ওই পাশে খাড়া দেয়াল, বাইরে থেকে কেউ নিতে পারবে না। নিতে হলে ভেতরের কাউকে নিতে হবে। ভেতরে ঝুমু ছাড়া আর কে আছে?"

বড় মামা মাথা নাড়ল, বলল, "তবু তো আমরা নিশ্চিত না। যদি হাতেনাতে ধরা যেত তাহলে একটা কথা ছিল।"

তখন সবাই একসাথে ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, সবার একসাথে মনে পড়ল যে ছোটাচ্চুর একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে। মেজো চাচি ছোটাচ্চুকে বলল, "তোমার না এত বড় ডিটেকটিভ এজেন্সি। এই চোরকে হাতেনাতে ধরে দাও।"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, "অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ—"



BOOK
50%
ROA
K P

ছোট খালার পুরানো মোবাইল ফোনটা গিয়েছে, সে একটু খুশিই হয়েছে, নতুন আরেকটা স্মার্টফোন কিনতে পারবে, কিন্তু চুরি হওয়া ফোনে সবার টেলিফোন নম্বর ছিল, সেটাই হয়েছে সমস্যা। তাই ছোট খালা বলল, "হ্যাঁ। আমার মোবাইলটা উদ্ধার করে দাও। তোমাকে একটা পুরস্কার দেব।"

ছোট চাচা আবার মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে মানে হয়েছে কী"— কিন্তু কী হয়েছে সেটা আর বলল না।

ছোট খালা তখন জানতে চাইল, "কী হয়েছে?"

"মানে—" ছোট চাচা ইতস্তত করে বলল, "হাতেনাতে ধরতে হলে ক্রাইমটা যখন ঘটে তখন থাকতে হয়। কিন্তু ক্রাইমটা তো ঘটে গেছে এখন তো আর হাতেনাতে ধরার সুযোগ নাই।"

মেজো চাচি ঠোঁট উল্টে বলল, "তাহলে তুমি কিসের ডিটেকটিভ হলে?"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, "ডিটেকটিভের কাজ হচ্ছে অপরাধীকে ধরা। এই কেসে সেটা তো ধরাই হয়ে গেছে। কাজেই আমার তো কোনো কাজ নাই।"

মেজো চাচি বলল, "কোথায় অপরাধীকে ধরা হয়েছে? আমি একটু আগে দেখেছি ঝুমু হি হি করে হাসতে হাসতে আনন্দে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ওকে ঠিক করে ধরতে হবে। দরকার হলে পুলিশে দিতে হবে।"

ছোটাচ্চু মুখটা সুচালো করে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "একটা কাজ করা যায়।"

"কী কাজ?"

"অপরাধীকে আরেকবার ক্রাইম করার সুযোগ করে দেওয়া যাক। এবার যখন ক্রাইম করবে, তখন হাতেনাতে ধরা হবে।"

বড় মামা এতক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, এবার বলল, "এটা অনৈতিক কাজ। একজন মানুষকে অপরাধ করতে প্ররোচনা দেওয়া অপরাধ করার মতোই অন্যায়—"

বড় মামি বলল, "রাখো তোমার নীতিকথা! আমাদের সোনা গয়না মোবাইল মানিব্যাগ হাওয়া হয়ে যাচ্ছে আর তোমার বড় বড় কথা।"

এই বাসায় যখনই বড়রা কথা বলে তখন সব সময়ই আশপাশে বেশ কিছু বাচ্চাকাচ্চা থাকে। এখানেও তারা আছে আর গভীর মনোযোগ দিয়ে

সব কথা শুনছে। সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছে টুনি। এখানে যে বাচ্চাকাচ্চা আছে তারা সবাই ঝুমু খালার ভক্ত, কেউ চিন্তাই করতে পারে না যে ঝুমু খালার মতো মানুষ এ রকম কাজ করতে পারে। হঠাৎ করে ছোটাচ্চুর খেয়াল হলো বেশ কিছু বাচ্চাকাচ্চা তার কথা শুনছে, সাথে সাথে খুব ব্যস্ত হয়ে ছোটাচ্চু সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিল, বলল, "যা ভাগ। ভাগ এখান থেকে।"

একজন আপত্তি করে বলল, "কেন? ভাগতে হবে কেন?"

ছোটাচ্চু হুংকার দিয়ে বলল, "আবার মুখে মুখে তর্ক করে? বের হ বলছি।"

কাজেই বাচ্চাকাচ্চাদের বের হয়ে আসতে হলো, তারা খুব মনমরা হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, তখন একজন বলল, "ঝুমু খালাকে সাবধান করে দিতে হবে।"

টুনি বলল, "কোনো দরকার নাই।"

সবাই একসাথে টুনির দিকে তাকাল, বলল, "কেন?"

"ঝুমু খালা মোটেও এইগুলো চুরি করে নাই।"

"তাহলে কে করেছে?"

টুনি উত্তরটা জানে না, তাই চুপ করে রইল। ত্যাঁদড় টাইপ জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে জানিস ঝুমু খালা চুরি করে নাই।"

'ঝুমু খালার অনেক বুদ্ধি। বুদ্ধিমান মানুষ বোকার মতো চুরি করে না।"

"তাহলে কে চুরি করেছে?"

"চুরি করেছে বাইরের কেউ।"

"বাইরের কেউ বাসার ভেতরে কেমন করে ঢুকেছে?"

টুনি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। বাইরের কেউ বাসার ভেতরে কেমন করে ঢুকেছে সে জানে না। হয়তো ঢোকেনি। বাসার ভেতরে না ঢুকেই কীভাবে বাসার ভেতরের জিনিস চুরি করে নেওয়া যায়, টুনি সেটা এখনো চিন্তা করে বের করতে পারল না। সে অবশ্য চিন্তা করা থামাল না, চিন্তা করতে লাগল। টুনি জানে ছোটাচ্চু এটা বের করতে পারবে না, তাকেই এটা বের করতে হবে।

ছোটাচ্চু চোরকে হাতেনাতে ধরার জন্য খুব গোপনে একটা ব্যবস্থা নিল। তার মোটা কলমের মতো ভিডিও ক্যামেরাটা নানির ঘরের জানালার সাথে বেঁধে দিল। বাঁধল অনেক উঁচুতে যেন ঘরের ভেতরে কেউ থাকলে সেটা সহজে চোখে না পড়ে। নানির বিছানার কাছে টেবিলে বেশ কিছু

লোভনীয় জিনিস ছড়িয়ে রাখা হলো। লোভনীয় জিনিসগুলো হলো কিছু টাকা, একটা মোবাইল ফোন এবং একটা গলার হার। হারটা দেখে সোনার মনে হলেও এটা আসলে ইমিটেশন, চোরের পক্ষে সেটা জানার কোনো উপায় নেই। ছোটাচ্চু তার ডিটেকটিভ এজেন্সির পুরো কাজটা করল খুব গোপনে, যেন কেউ সেটা টের না পায়। কিন্তু বাচ্চারা সবাই সেটা জেনে গেল কিন্তু সবাই ভান করল তারা জানে না। বাসার বড় মানুষদের শান্ত রাখার জন্য তাদের সবারই মাঝে মাঝে এ রকম কিছু করতে হয়। বড় মানুষদের নানা কাজকর্ম দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, বুঝেও না বোঝার ভান করতে হয়।

ছোটাচ্চু মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিল পরদিন ভোরের মধ্যে চোরের সব কাজকর্ম ভিডিও ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে। এভাবে হাতেনাতে ধরা পড়ার পর চোরকে শায়েস্তা করার কাজটা হবে পানির মতো সোজা।

ছোটাচ্চু কখনোই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে পারে না কিন্তু পরদিন সে অ্যালার্ম ছাড়াই ঘুম থেকে উঠে পড়ল। ঘুম থেকে উঠেই সে নানির ঘরে ছুটে এল, বিছানার কাছে টেবিলে টাকা, মোবাইল ফোন কিংবা ইমিটেশন সোনার হার কেউ ধরে দেখেনি, সেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই আছে। ঘরের মাঝখানে টুনি দাঁড়িয়েছিল, সে আঙুল দিয়ে জানালার ওপরে দেখিয়ে বলল, "নিয়ে গেছে।"

"কী নিয়ে গেছে?"

"তোমার ভিডিও ক্যামেরা।"

ছোটাচ্চু চমকে উঠল, জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, "কে নিয়েছে?"

"মনে হয় চোর।"

ছোটাচ্চু প্রায় হাহাকার করে বলল, "আ-আ-আমার এত দামি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে গেছে?"

টুনি কোনো কথা বলল না, সে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না। ছোটাচ্চু তখন আরও জোরে হাহাকার করে বলল, "কেমন করে নিল?"

টুনি এবার উত্তর দিল, বলল, "তুমি চেয়ারের ওপর একটা মোড়া রেখে তার ওপর দাঁড়িয়ে তোমার ভিডিও ক্যামেরা ফিট করেছিলে।"

"তু-তুই কেমন করে জানিস?"

"সবাই জানে। তোমরা মনে করো তোমরা কী কর সেটা ছোটরা জানে না। ছোটরা সবকিছু জানে। এই বাসার বড় মানুষেরা একটু হাবা টাইপের।"

"হ-হাবা টাইপের?"

টুনি এই প্রশ্নের উত্তর দিল না, বলল, "তুমি অনেক উঁচুতে ভিডিও ক্যামেরাটা লাগিয়েছ, সেটা খুলে নিতে হলে চোরটাকে অন্তত আট ফুট লম্বা হতে হবে। এই বাসায় আট ফুট লম্বা কোনো মানুষ নাই, বাইরে থেকে এই বাসায় কোনো মানুষ ঢুকে নাই।"

"তাহলে?"

টুনি বলল, "তুমি ডিটেকটিভ, তুমি বের করো।"

এ রকম সময় নানি ঘরে ঢুকলেন, তার ঘরে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। নানি এদিক-সেদিক কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী খুঁজছ, মা।"

"আমার পানের বাটা।"

নানিকে একজন খুব ছোট—প্রায় সিগারেটের বাক্সের সাইজের একটা পানের বাটা এনে দিয়েছিল। নানি বাইরে কোথাও গেলে সেটাতে পান-সুপারি ভরে ব্যাগে করে নিয়ে যান। মনে হলো নানি সেটা খুঁজে পাচ্ছেন না।

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কোথায় রেখেছিলে?"

নানি বললেন, "এই তো। এইখানে, জানালার কাছে।"

খুঁজে দেখা গেল জানালার কাছে কিছু নেই। টুনি গম্ভীর গলায় বলল, "চোর টাকা, মোবাইল কিংবা সোনার হার নেয় নাই কিন্তু নানির পানের বাটা নিয়ে গেছে।"

ছোটাচ্চু কোনো উত্তর না দিয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দামি ভিডিও ক্যামেরাটার দুঃখ সে এখনো ভুলতে পারছে না। টুনি কিছুক্ষণ ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ছোটাচ্চু।"

"কী হলো?"

"কী হচ্ছে তুমি বুঝতে পারছ?"

"না। কী হচ্ছে?"

টুনি হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না? জানালার কাছে কিছু থাকলেই সেটা চুরি হচ্ছে। নানির পানের বাটা, তোমার

ভিডিও ক্যামেরা, মেজো চাচির কানের দুল, ছোট খালার মোবাইল টেলিফোন, বড় মামার মানিব্যাগ, এর প্রত্যেকটা ছিল জানালার কাছে। তার অর্থ জানালার বাইরে থেকে কেউ এগুলো নিচ্ছে।"

ছোটাচ্চু মুখ খিঁচিয়ে বলল, "গাধার মতো কথা বলিস না। জানালার ওই পাশে দাঁড়ানোর জায়গা আছে? খাড়া দেয়াল!"

টুনি মাথায় টোকা দিয়ে বলল, "ব্রেনটাকে ব্যবহার করো। থিংক। থিংক। থিংক। ডিটেকটিভদের চিন্তা করতে হয়। তোমার সমস্যা হলো, তুমি চিন্তা করো না।"

ছোটাচ্চু আরও রেগে গিয়ে বলল, "বড় বড় কথা বলিস না। ভাগ এখান থেকে।"

কাজেই টুনি সরে পড়ল।

দিনটা ছুটির দিন ছিল, তাই বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করেই বাসা থেকে বের হয়ে গেল হাজি গুলজার খানের বাসায় মেলা দেখতে। আজকের মেলা খুবই জমেছে। রনপা লাগিয়ে দশ ফুট উঁচু একজন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার হাতে লজেন্স, ছোট বাচ্চারা গেলেই ওপর থেকে তাদের দিকে লজেন্স ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট কিছু কুকুরের খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুকুরগুলো একটা ছোট ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে ড্রামটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচ্ছে, ভারি মজা দেখতে। মাঠের এক কোনায় পর্দা দিয়ে ঢেকে একটা জায়গায় নর রাক্ষসের আসর করা হয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় একবার করে নররাক্ষস এসে জ্যান্ত হাঁস-মুরগি-ছাগল খেয়ে ফেলে, তখন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। এখানে ছোট বাচ্চাদের ঢোকা নিষেধ, তাই তারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। সাপের খেলার সাথে এখন একটা বেজি আনা হয়েছে। বেজি আর সাপ একে অন্যের সাথে মারামারি করে—রীতিমতো ভয়ংকর দৃশ্য। বানরের খেলা তো আছেই।

বাচ্চারা ঘুরে ঘুরে সব খেলা দেখছে, টুনি ছাড়া। সে সেই সকাল থেকে বানরওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে ধৈর্য ধরে বানরের খেলা দেখেই যাচ্ছে—বারবার একই খেলা। টুনি অপেক্ষা করে থাকে খেলার শেষটা দেখার জন্য। তখন বানরটা সন্ত্রাসী গডফাদার হয়ে মোবাইল ফোন দিয়ে ফোন করে। টুনি তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোবাইল ফোনটা লক্ষ করে। বানরওয়ালা তার ঝোলার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একেকবার একেকটা ফোন

বের করে দেয়। এই বানরওয়ালার কাছে অনেকগুলো মোবাইল ফোন। টুনি বানরওয়ালার ঝোলাটা লক্ষ করল, লাল রঙের একটা ঝোলা। এক টুকরা লাল সালুর চারকোনা বেঁধে একটা ঝোলা তৈরি করা হয়েছে। এই ঝোলার ভেতরে শুধু মোবাইল ফোন না, মনে হয় আরো অনেক কিছু আছে।

"টুনি, দশ টাকা ধার দিবি?" গলার স্বর শুনে টুনি ঘুরে তাকাল, ত্যাঁদড় টাইপ তার কাছে টাকা ধার চাইতে এসেছে। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা। অনেকগুলো বাচ্চাকাচ্চা বলে এখন পর্যন্ত টুনি ছাড়া অন্য কারও নাম বলা হয়নি, এখন মনে হয় ত্যাঁদড় টাইপের নামটা বলা যায়। তার নাম হচ্ছে শান্ত, যদিও নামকরণটি একেবারেই ঠিক হয়নি। "দুর্দান্ত" হলে ঠিক হতো, অন্ততপক্ষে "অশান্ত" হওয়া উচিত ছিল। শান্ত টুনির থেকে দুই বছরের বড় কিন্তু তার বাড়ন্ত শরীর দেখে তাকে আরও বড় মনে হয়।

শান্ত টুনির কাছে মুখ এনে বলল, "দিবি? কালকেই ফেরত দিয়ে দেব।"

শান্তকে টাকা ধার দিয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোনো টাকা ফেরত পায়নি কিন্তু টুনি শান্তকে সেটা মনে করিয়ে দিল না। জিজ্ঞেস করল, "কী জন্য?"

"নররাক্ষসের খেলা দেখব। বাচ্চাকাচ্চাদের ঢোকা নিষেধ তাই আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। গেটে যে মানুষটা আছে তার সাথে কথা বলেছি। দশ টাকা ঘুষ দিলে আমাকে ঢুকতে দেবে।"

শান্তকে কেউ কখনো টাকা ধার দেয় না, দেওয়া উচিত না কিন্তু টুনি তার পকেট থেকে দুইটা দশ টাকার নোট বের করে বলল, "আমি তোমাকে দশ টাকা না, পুরো বিশ টাকা দেব। ধারও না, একেবারে দিয়ে দেব। এই টাকা তোমার ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

শান্তর চোখ চকচক করে উঠল, "কী কাজ?"

"সেটা তোমাকে একটু পরে বলব। ঠিক আছে?"

শান্ত মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে।" কী কাজ তার জানার প্রয়োজন নেই। দশ টাকার জন্য সে যেকোনো কাজ করতে রাজি আছে। এর অর্ধেক টাকা বাজি ধরে সে একবার একজনের জুতার তলা চেটে দিয়েছিল।

টুনি শান্তকে দশ টাকার একটা নোট দিল, বলল, "দশ টাকা অ্যাডভান্স। কাজ শেষ হলে বাকি দশ টাকা।"

"কী করতে হবে বল।"

"একটু পরে বলব, তুমি এখন নররাক্ষসের খেলা দেখে এসো।"

শান্ত দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে নররাক্ষসের খেলা দেখতে ছুটে গেল, টুনি রওনা দিল বাসার দিকে। কী করবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে। এখন সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ করতে পারলে হয়।

বাসার সিঁড়িতে টুনির সাথে ঝুমু খালার দেখা হলো। সে সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মুখ দেখে মনে হলো একটু আগে হয়তো কেঁদেছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ঝুমু খালা?"

ঝুমু খালা মাথা নেড়ে বোঝাল কিছু হয়নি। এর আগে যখনই তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সে প্রতিবারই বিদঘুটে কিছু একটা উত্তর দিয়েছে। কী নাশতা তৈরি হয়েছে জিজ্ঞেস করার পর আজ সকালেই ঝুমু খালা বলেছে, "পরোটার সাথে বাঘের মাংস। বাঘের মাংস সেদ্ধ হতে চায় না বলে অনেকক্ষণ জ্বাল দিতে হচ্ছে, আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য অনেক বেশি গরম মসলা দিতে হয়েছে।" সেই ঝুমু খালা মুখে কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে উত্তর দিচ্ছে, বিষয়টা যথেষ্ট অস্বাভাবিক। টুনি সাধারণত দ্বিতীয়বার কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না কিন্তু আজকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? বলো।"

ঝুমু খালা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি নাকি চোর। আমি নাকি মোবাইল ফোন, কানের দুল এইসব চুরি করছি। খোদা আমারে গরিব বানাইছে কিন্তু চোর তো বানায় নাই।" বলে ঝুমু খালা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল।

টুনি সিঁড়িতে ঝুমু খালার পাশে বসে বলল, "তুমি চুরি করো নাই।" ঝুমু খালা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমি জানি। কিন্তু তোমরা পোলাপান মানুষ, তোমরা বললে কে বিশ্বাস করবে।"

"করবে। আমি যখন আসল চোরকে ধরব তখন সবাই বিশ্বাস করবে।"

ঝুমু খালা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল। টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আসল চোর কে সেইটা জানো?"

"এখনো পুরোপুরি জানি না। কিন্তু অনুমান করতে পারি।"

"কে?" ঝুমু খালা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "কোন বান্দীর পোলা? আমি যদি হারামজাদার মুণ্ডু ছিঁড়ে না আনি তাহলে আমি বাপের বেটি না—"

টুনি ঝুমু খালার কথা শুনে একটু হেসে ফেলল। বলল, "আস্তে ঝুমু খালা, আস্তে। আগেই এত ব্যস্ত হয়ো না, মুণ্ডু ছিঁড়তে হবে নাকি লেজ ছিঁড়তে হবে, এখনো আমরা সেটা জানি না।"

"লেজ?" ঝুমু চোখ কপালে তুলে বলল, "লেজ?"

"একটু পরেই সেটা জানতে পারব। তুমি খালি আমাকে একটা কাজ করে দাও।"

"কী কাজ?"

"লাল কাপড়ের একটা ঝোলা তৈরি করে দাও।"

ঝুমু খালা অবাক হয়ে বলল, "লাল কাপড়ের ঝোলা?"

"হ্যাঁ। পারবে?"

ঝুমু খালা খানিকক্ষণ কিছু একটা চিন্তা করে বলল, "ছোট ভাবির একটা লাল পেটিকোট ধুতে দিয়েছে। সেটা দিয়ে বানানো যায়—"

টুনি ব্যস্ত হয়ে বলল, "প্লিজ প্লিজ বানিয়ে দাও। এক্ষুনি। একেবারে সত্যি ঝোলা হতে হবে না, ঝোলার মতো হলেই হবে। আমি নষ্ট করব না, আবার ফিরিয়ে দেব।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"মোবাইল, মানিব্যাগ আর কানের দুলের চোর হয়ে আছি। তার সাথে পেটিকোট চোর হতে চাই না।"

ঝুমু খালা ময়লা কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা লাল পেটিকোট বের করে সেটাকে বেশ কায়দা করে ভাঁজ করে এদিকে-সেদিকে কয়েকটা সেফটিপিন লাগিয়ে দিয়ে একটা ঝোলার মতো করে দিল। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা আলু, বসার ঘর থেকে দু-একটা বই, বাথরুম থেকে কয়েকটা শ্যাম্পুর খালি বোতল ভরে টুনি ঝোলাটাকে মোটামুটি ভরে নিল।

ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, "ঠিক হইছে?"

টুনি মাথা নাড়ল।

ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করবা?"

"চোর ধরতে যাব।"

"কোনো বিপদ হবে না তো?"

"এখনো জানি না।"

"সাবধান।"

টুনি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ছোটাচ্চুর ঘরে গেল। ছোটাচ্চু বিছানায় আধশোয়া হয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার হলুদ বইটা পড়ছে। টুনিকে দেখে মুখ শক্ত করে বলল, "কী খবর টুনটুনি? এই লাল ঝোলা নিয়ে কী করিস?"

টুনি প্রশ্নটা না শোনার ভান করে বলল, "আমি যদি তোমার ভিডিও ক্যামেরা, মেজো চাচির কানের দুল, বড় মামার মানিব্যাগ, ছোট খালার মোবাইল ফোন, নানির পানের বাটার চোরকে ধরে দিই, তাহলে তুমি কি আমাকে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাবে?"

ছোট চাচা চোখ বড় বড় করে বলল, "কী বললি? কী বললি তুই?"

"আমি কী বলেছি তুমি শুনেছ।"

"তুই জানিস, চোর কে?"

"এখনো জানি না। পনেরো মিনিটের মধ্যে জানব।"

"প-পনেরো মিনিট? কীভাবে?"

"যদি দেখতে চাও তাহলে ঠিক পনেরো মিনিট পরে তুমি হাজি গুলজার খানের মাঠে মেলাতে বানরের খেলা দেখতে এসো।"

ছোটাচ্চুর মুখটা কেমন যেন হাঁ হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, "গু-গু-গুলজার খানের মাঠে? বা-বা-বানরের খেলা?"

"হ্যাঁ। ঠিক পনেরো মিনিট পরে। আগে আসলেও হবে না, পরে আসলেও হবে না।"

ছোটাচ্চু ততক্ষণে বিছানা থেকে নেমে এসেছে। হলুদ বইটা টেবিলে রেখে টুনির দিকে এগিয়ে এল। টুনি অপেক্ষা করল না। দরজা বন্ধ করে তার লাল ঝোলা নিয়ে ছুটতে লাগল। বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হয়ে এক দৌড়ে হাজি গুলজার খানের মাঠে।

ত্যাঁদড় টাইপ শান্তকে খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হলো না। সে রনপা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষটিকে জ্বালাতন করছিল, টুনিকে দেখে এগিয়ে এসে, বলল, "দে আমার বাকি দশ টাকা।"

"দেব। আগে আমার কাজটা করে দাও।"

"কী কাজ?" তখন তার হঠাৎ করে টুনির কাঁধে ঝোলানো লাল ঝোলাটা চোখে পড়ল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই ক্যাটক্যাটে লাল ঝোলা কই পেলি? ভেতরে কী?"

"একটু পরেই তুমি দেখবে। আগে আমার কাজটা করে দাও।"

"কী কাজ?"

"ওই যে বানরওয়ালা খেলা দেখাচ্ছে, আমি সেখানে গিয়ে বানরওয়ালার ঠিক পেছনে দাঁড়াব। তুমি দাঁড়াবে সামনে। বানরটা খেলা দেখাতে দেখাতে যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি বানরের গলার দড়িটা ধরে একটা টান দিয়ে বানরওয়ালার হাত থেকে ছুটিয়ে আনবে।"

"ছুটিয়ে আনব?"

"হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হবে না। আমি দেখেছি দড়িটা সে পায়ের নিচে চাপা দিয়ে রাখে, টান দিলেই ছুটে আসবে।"

"কিন্তু কিন্তু—"

টুনি শান্ত গলায় বলল, "আমার কথা এখনো শেষ হয় নাই।"

শান্ত মুখ শক্ত করে বলল, "শেষ কর তাহলে।"

"বানরের দড়িটা ছুটিয়ে নেওয়ার পর বানরটাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালাবে।"

শান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, "ছুটে পালাব?"

"হ্যাঁ।"

"বানর কোলে নিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি প্রকাশ্য দিনের বেলায় হাজার হাজার মানুষের সামনে একটা বানরকে চুরি করে নিয়ে যাব? তারপর পাবলিক যখন পিটিয়ে আমাকে তক্তা বানাবে—"

টুনি বলল, "মোটেও তক্তা বানাবে না। পাবলিক কিছু বুঝতেই পারবে না কী হচ্ছে, শুধু বানরওয়ালা তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। তখন তুমি বানরওয়ালার সাথে ঝগড়া শুরু করবে।"

"ঝগড়া? আমি বানর চুরি করব আর আমিই আবার ঝগড়া করব?"

"কেন? সমস্যা আছে? তুমি ঝগড়া করতে পারো না? তোমার চাইতে ভালো ঝগড়া আর কে করতে পারে?"

শান্ত এটাকে প্রশংসা হিসেবে ধরে নিয়ে বলল, "কী নিয়ে ঝগড়া করব?"

"যা খুশি। ইচ্ছে হলে তুমি বলতে পারো যে বানরের খেলা দেখানো অমানবিক, এটা নিরীহ পশুর প্রতি অত্যাচার। তুমি পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির মেম্বার। তুমি বানরটাকে বনে ছেড়ে দেবে। এসব।"

শান্ত কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু দশ টাকায় হবে না।"

"কত লাগবে?"

"একশ।"

"বিশ।"

"উহু। পঞ্চাশ টাকার এক পয়সা কম না।"

কিছুক্ষণ দরদাম করে ত্রিশ টাকায় রফা হলো। টুনি দশ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বলল, কাজ শেষ হলে বাকি টাকা দেওয়া হবে। শান্ত একটু দুশ্চিন্তা করছিল, টুনি সাহস দিয়ে বলল, "তোমার কাজ খুব সহজ, বানরওয়ালাকে ব্যস্ত রাখা। তুমি চোখের কোনা দিয়ে আমাকে লক্ষ করবে। যখন দেখবে আমি সরে গেছি তখন তোমার কাজ শেষ। তখন বানরওয়ালাকে বানর ফেরত দিতে পারো কিংবা ইচ্ছা করলে তোমার কাছে রেখে দিতে পারো।"

"তুই কী করবি?"

টুনি তার ঝোলাটা দেখিয়ে বলল, "আমি আমার ঝোলাটার সাথে বানরওয়ালার ঝোলাটা বদলে নেব।"

শান্ত আবার চোখ কপালে তুলে বলল, "কেন?"

"একটু পরেই দেখবে।"

"কোনো ঝামেলা হবে না তো?"

টুনি কোনো উত্তর দিল না, শুধু তার ঠোঁটের কোনায় বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল।

একটু পরেই দেখা গেল, টুনি ভিড় ঠেলে একেবারে বানরওয়ালার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লাল ঝোলাটা সে হাতে ধরে রেখেছে। বানরওয়ালার পাশে তার লাল ঝোলা, দুটো দেখতে হুবহু একরকম নয় কিন্তু সেটা বোঝার জন্য খুব ভালো করে লক্ষ করতে হবে কেউ সেভাবে লক্ষ করছে না।

শান্ত ভিড় ঠেলে একটু সামনে এগিয়ে গেল, তার চোখে-মুখে এক ধরনের উত্তেজনা। বানরটা খেলা দেখাচ্ছে, প্রথমে ঘুরে ঘুরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া দেখাল, তারপর শ্বশুরকে সালাম করা দেখাল। যখন বানরটা শাশুড়িকে ভেংচি কাটা দেখাচ্ছে তখন শান্ত হঠাৎ করে তড়াক করে লাফ দিয়ে বানরের দড়িটা হেঁচকা টান দিয়ে ছুটিয়ে আনে, তারপর কেউ কিছু বোঝার আগে দড়ি ধরে বানরকে নিয়ে দে দৌড়। লোকজন ভ্যাবাচেকা

খেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, শুধু বানরওয়ালা "এই, এই ছ্যামড়া কী করো? কী করো? আমার বান্দর, আমার বান্দর" বলে শান্তর পেছনে পেছনে দৌড়াতে থাকে। সবাই যখন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছে, টুনি তখন তার ঝোলাটা বানরওয়ালার ঝোলার পাশে ফেলে দিয়ে পরমুহূর্তে তুলে নিল। খুব ভালো করে লক্ষ না করলে কেউ বুঝতে পারবে না নিজের ঝোলাটা ফেলে সে বানরওয়ালার ঝোলাটা তুলে নিয়েছে। টুনি একটুও তাড়াহুড়া করল না, বানরওয়ালার ঝোলা নিয়ে খুব শান্তভাবে হেঁটে সরে গেল।

একটু দূরেই তখন শান্ত আর বানরওয়ালার মাঝে তুমুল ঝগড়া লেগে গেছে। শান্ত বলছে, "আপনি জানেন বানরের খেলা দেখানো বেআইনি? বনের পশু থাকবে বনে, আর আপনি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

বানরওয়ালা তেড়িয়া হয়ে বলল, "বেআইনি হলে সেটা আমার সমস্যা। তুমি আমার বান্দর নিয়ে কই যাও?"

"আপনাকে পুলিশে দেওয়া হবে। আমি পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির সেক্রেটারি। আমার কমিটি আপনাকে পুলিশে দেবে। হাইকোর্টে মামলা করবে।"

বানরওয়ালা চোখ কপালে তুলে বলল, "কী আলতু ফালতু কথা কও? আমি গরিব মানুষ, বান্দরের খেলা দেখাই, আর তুমি আমার বিরুদ্ধে মামলা করবা?"

শান্ত হাত-পা নেড়ে বলল, "আপনি বানরকে খেতে দেন? এই বানর এত শুকনো কেন? বানরের স্বাস্থ্য এত খারাপ কেন? কোনোদিন মেডিকেল চেকআপ করিয়েছেন? আপনি কি বানরকে শাস্তি দেন? অত্যাচার করেন?"

টুনি একটু সরে গিয়ে বানরওয়ালার ঝোলাটার ভেতরে উঁকি দিল। ওপরে একটা ময়লা গামছা। সেটা সরানো মাত্র ভেতরে সে নানির পানের বাটা দেখতে পেল। তার পাশে ছোটাচ্চুর ভিডিও ক্যামেরা। বেশ কয়েকটা মোবাইল, অনেকগুলো মানিব্যাগ, মনে হলো একটা ল্যাপটপও আছে। টুনির মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তার সন্দেহ পুরোপুরি ঠিক। সে রহস্যময় চোরকে ধরে ফেলেছে।

শান্ত ঝগড়া করে বেশি সুবিধা করতে পারেনি। দেখা গেল বানরওয়ালা তার বানর নিয়ে ফিরে আসছে। হাজি গুলজার খানের বাড়ির দারোয়ানকেও

দেখা গেল, মেলায় গোলমাল করার জন্য সে শান্তকে মেলা থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। টুনি ঠিক এই রকম সময় ছোটাচ্চুকে দেখতে পেল, লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই টুনি বানরওয়ালার লাল ঝোলাটা তার হাতে ধরিয়ে দিল, বলল, "নাও। এইখানে সব চোরাই মালপত্র আছে। আমাদের বাসারগুলো আছে, অন্য বাসারগুলোও আছে।"

ছোটাচ্চু মুখ হাঁ করে বলল, "চো-চোরাই মাল। কে চুরি করেছে?"

"বানরওয়ালা। বানরকে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছে, তার বানর বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে যা পায় তুলে নিয়ে আসে।"

ছোটাচ্চু বলল, "বা-বা-বা..." নিশ্চয়ই বানর বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না।

বানরওয়ালা তখন নিজের জায়গায় গিয়ে বসে তার ঝোলার দিকে তাকিয়েছে, হঠাৎ করে তার কিছু একটা সন্দেহ হলো, সে ঝোলাটার ভেতরে উঁকি দেয়, তারপর অবাক হয়ে ঝোলাটার দিকে তাকাল সাথে সাথে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে আতংকিত হয়ে এদিক-সেদিক তাকায় এবং হঠাৎ দূরে ছোটাচ্চু আর টুনিকে দেখতে পেল। ছোটাচ্চুর হাতে তার লাল ঝোলা। দেখে সাথে সাথে বুঝে গেল সে ধরা পড়ে গেছে। ছোটাচ্চুর হাত থেকে নিজের ঝোলা উদ্ধার করার কোনো চেষ্টা না করে হঠাৎ সে তার বানরকে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। ট্রেনিং পাওয়া বানর, এক লাফ দিয়ে সেটা তার ঘাড়ে উঠে বসল, আর বানরওয়ালা তার বানর ঘাড়ে নিয়ে হাজি গুলজার খানের বাড়ির গেটের দিকে প্রাণপণে ছুটতে থাকে।

এতক্ষণে ছোটাচ্চু নিজেকে সামলে নিয়েছে। চিৎকার করে বলল, "ধরো। ধরো বানরওয়ালাকে। এই ব্যাটা চোর। মহাচোর।"

ছোটাচ্চুর কথা শেষ না হতেই লোকজন বানরওয়ালাকে ধাওয়া করল, টুনি দেখল সবার আগে শান্ত। কী হয়েছে, কেন বানরওয়ালাকে ধরতে হবে, সে কিছুই জানে না, কিন্তু মহা-উৎসাহে সে পেছন থেকে ল্যাং মেরে বানরওয়ালাকে ফেলে দিল। তার বানর মনে হয় আগেও এ রকম অবস্থায় পড়েছে, সেটা কয়েকটা লাফ দিয়ে বড় একটা মান্দার গাছের মগডালে উঠে কৌতূহল নিয়ে নিচের দিকে তাকাল। মনে হয় অনুমান করার চেষ্টা করছে, এখন কী হবে।

চোর ধরা পড়লেই পাবলিক প্রথমে আচ্ছা মতন পিটুনি দেয়। এখানেও তা-ই শুরু হয়ে গেল। ছোটাচ্চু তখন অনেক কষ্ট করে বানরওয়ালাকে পাবলিকের পিটুনি থেকে রক্ষা করল, ততক্ষণে বাসার দারোয়ান এমনকি দুজন পুলিশও চলে এসেছে। সবাই জানতে চাইছে কী হয়েছে, ব্যাপারটা বুঝতে চাইছে।

ছোটাচ্চু বলল, "এই বানরওয়ালা মহাচোর। বানরের খেলা দেখানো তার সাইড বিজনেস। আসলে রাতের বেলা বানরকে ছেড়ে দেয় বাসায় বাসায় চুরি করার জন্য। বানরকে চুরি করা শিখিয়েছে।"

একজন পুলিশ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন করে জানেন?"

ছোটাচ্চু তার ঝোলাটা দেখাল, বলল, "এই যে বানরওয়ালার ঝোলা। এই ঝোলা বোঝাই চোরাই মাল। আমাদের বাসা থেকে চুরি করা সব জিনিস এখানে আছে। অন্যের বাসার জিনিসও আছে।"

পাবলিক তখন আবার খেপে উঠল, বলল, "ধর শালা বানরওয়ালাকে। মার শালাকে।"

আবার কয়েকটা কিল-ঘুষি পড়ল কিন্তু এবারে পুলিশ সবাইকে থামিয়ে দিল। ঝোলাটার ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!" তারপর ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেমন করে এই ব্যাটাকে ধরলেন?"

ছোটাচ্চু উত্তর দেওয়ার আগেই টুনি বলল, "খুবই সোজা। ইনি হচ্ছেন দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রধান ডিটেকটিভ। ইনি যেকোনো কেস সলভ করতে পারেন। চুরি, ডাকাতি, খুন যেকোনো কিছু উনার হাতের ময়লা!"

পুলিশটা অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকাল, "সত্যি? তার মানে ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

"হ্যাঁ। আর আমি হচ্ছি উনার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

ছোটাচ্চু একবার শুকনো মুখে ঢোঁক গিলল, কিন্তু প্রতিবাদ করল না।

এভাবে টুনি দি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রধান ডিটেকটিভের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেল।



এই বাসার সবচেয়ে যে চুপচাপ মেয়ে, সে ছোট চাচার কাছে এসে বলল, "ছোটাচ্চু, তোমার সাথে একটা কথা আছে।"

মেয়েটা যেহেতু খুব চুপচাপ, কথা বলে কম, তাই সে যখন কথা বলে, তখন সবাই আগ্রহ নিয়ে শোনে। তাই ছোটাচ্চুও আগ্রহ নিয়ে বলল, "কী কথা, টুম্পা?"

চুপচাপ মেয়েটার নাম টুম্পা। যেহেতু সে চুপচাপ, তাই এই বাসায় এই নাম ধরে খুব বেশি ডাকাডাকি হয় না।

টুম্পা বলল, "তুমি তো একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছ।"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ, খুলেছি।"

"তুমি কি আমার একটা কেস নেবে?"

ছোটাচ্চু হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিক হাসতে পারল না। তাই শুধু হাসির মতো একটা শব্দ বের হলো। শব্দটা শেষ করে বলল, "দেখ টুম্পা, আমি মনে হয় তোদের ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারি নাই। আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি কিন্তু মোটেও ছেলেখেলা না।"

টুম্পা বলল, "আমার কেসটাও ছেলেখেলা না।"

ছোটাচ্চু একটু থতমত খেয়ে বলল, "তোর কেসটা কী?"

টুম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হলো, মনে মনে ঠিক করে নিল কী বলবে। তারপর গলা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করল। টুম্পা এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু যখন কথা বলতে হয়, গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করে। টুম্পা বলল, "আমাদের স্কুলে আগে টিফিন দিত। কোনোদিন রুটি-সবজি, কোনোদিন খিচুড়ি, কোনোদিন আলুচপ, কোনোদিন মাংস-পরোটা। টিফিনগুলো হতো খুবই খারাপ, মুখে দেওয়ার মতো না। টিফিন খেয়ে একবার সবার ডায়রিয়া হয়ে গিয়েছিল। শুধু আমার হয় নাই।"

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেন? তোর হয় নাই কেন?"

"তার কারণ, আমি কোনোদিন স্কুলের টিফিন খাই নাই।"

ছোটাচ্চু ভুরু আরও বেশি কুঁচকে বলল, "কেন টিফিন খাস নাই? না খেয়ে থাকলে পেটে গ্যাস্ট্রিক না হলে আলসার হয়ে যেতে পারে, জানিস?"

টুম্পা বলল, "টিফিন খেয়ে মরে যাওয়া থেকে না খেয়ে গ্যাস্ট্রিক আর আলসার হওয়া অনেক ভালো। স্কুলের টিফিন খেয়ে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মরে যেত। তখন স্কুল থেকে টিফিন বন্ধ করে দিল। নিয়ম করে দিল, এখন থেকে সবাইকে বাসা থেকে নিজের টিফিন নিজেকে আনতে হবে।"

"তুই এখন বাসা থেকে টিফিন নিয়ে যাস?"

"হ্যাঁ। আম্মু প্রতিদিন আমার জন্য টিফিন বানিয়ে দেয়। কিন্তু—" বলে টুম্পা চুপ করে গেল।

"কিন্তু কী?"

টুম্পা বলল, "সেই জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি।"

"কী জন্য এসেছিস?" ছোটাচ্চু এবার একটু অধৈর্য হলো।

"আমার কেস।"

"তোর কী কেস?"

"প্রত্যেকদিন কেউ একজন আমার টিফিন খেয়ে ফেলে। তোমাকে বের করে দিতে হবে, কে আমার টিফিন খায়।" টুম্পা কথা শেষ করে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটাচ্চু হতাশ ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, তারপর বলল, "দেখ টুম্পা, আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি হচ্ছে সিরিয়াস বিজনেস। কে তোর টিফিন খেয়ে ফেলে, সেটা বের করা মোটেও আমার এজেন্সির কাজ না।"

টুম্পা বলল, "তুমি সত্যিকারের ডিটেকটিভ হলে নিশ্চয়ই বের করতে পারবে।"

"আমি একশবার সত্যিকার ডিটেকটিভ।" ছোটাচ্চু মুখটা গম্ভীর করে বলল, "ডিটেকটিভ হতে হলে যা যা শিখতে হয়, আমি সবকিছু শিখে ফেলেছি। মার্ডার সিনে কেমন করে আলট্রাভায়োলেট-রে দিয়ে রক্তের চিহ্ন বের করতে হয় তুই জানিস? জানিস না। আমি জানি। আঙুলের ছাপ কেমন করে নিতে হয় তুই জানিস? জানিস না। আমি জানি। ব্লাড টেস্ট করে কেমন করে বের করতে হয় কী ড্রাগস খেয়েছে তুই জানিস—"

টুম্পা বলল, "কে আমার টিফিন খেয়ে ফেলে সেটা বের করে দেবে কি না বলো।"

"দেখ টুম্পা, তোকে আমি মনে হয় বোঝাতে পারি নাই—"

টুম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে তুমি বের করে দেবে না। ঠিক আছে, আমি টুনি আপুর কাছে যাব। টুনি আপু তো তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, নিশ্চয় বের করে দেবে।"

ছোটাচ্চু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, টুম্পা তার সুযোগ না দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে টুনির কাছে হাজির হল।

টুনি গভীর মনোযোগ দিয়ে টুম্পার কথা শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "ক্লাসে কি শুধু তোর টিফিন চুরি হয়, নাকি আরও ছেলেমেয়ের টিফিন চুরি হয়?"

"মনে হয় শুধু আমার।"

"তোর ক্লাসে টিফিন ছাড়া আর কিছু কি চুরি হয়?"

"মনে হয় না।"

"তোর টিফিন কি প্রতিদিন চুরি হয়?"

"যেদিন আম্মু স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়, সেদিন হয় না। মনে হয়, চোর স্যান্ডউইচ পছন্দ করে না।"

"তুই কি কাউকে সন্দেহ করিস?

"আমাদের ক্লাসে অসম্ভব দুষ্টু একটা ছেলে আছে, অসম্ভব পাঁজি একটা মেয়ে আছে, তারা হতে পারে?"

"কিন্তু তোর কাছে কি প্রমাণ আছে?"

"নাই।"

টুনি চিন্তিত মুখে বলল, "প্রমাণ না থাকলে তো লাভ নাই।" তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোর যে টিফিন চুরি হয়ে যায়, সেটা কি আর কেউ জানে?"

"জানে।"

"কে জানে?"

"আমার যে বন্ধু আছে জিকু, সে জানে।"

"জিকু ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে।"

"সে কেমন করে জানে?"

"আমি বলেছি, সেই জন্য জানে। জিকুও টিফিনচোর ধরার চেষ্টা করেছে, পারে নাই। আমি যখন বাথরুমে কিংবা অন্য কোথাও যাই, তখন জিকু পাহারা দেয়। তার পরও টিফিন চুরি হয়ে যায়।"

টুনি বলল, "হুম্।"



"জিকুর মনটা খুব ভালো। যখন আমার টিফিন চুরি হয়ে যায়, আমাকে তার টিফিন খেতে দেয়।"

"তুই খাস?"

"উঁহু।" টুম্পা যতটুকু জোরে মাথা নাড়ার কথা, তার থেকে অনেক বেশি জোরে মাথা নাড়ল।

"কেন খাস না?"

"জিকুর আম্মা একেবারে টিফিন বানাতে পারে না। যে টিফিন তৈরি করে দেয়, সেগুলো খাওয়া যায় না।"

"কী টিফিন দেয়?"

"একটা শক্ত রুটি, তার মাঝখানে ডাল।"

"আর?"

"আর কিছু না। প্রতিদিন একই জিনিস।"

"একই জিনিস?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে রুটি বেশি শক্ত, মাঝে মাঝে কম শক্ত। ডালটা মাঝে মাঝে ল্যাদল্যাদা, মাঝে মাঝে আঠা আঠা।"

টুনি বলল, "হুম্।"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি বের করতে পারবে, কে আমার টিফিন চুরি করে?"

টুনি বলল, "মনে হয় পারব।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। শুধু একটু বিপদ আছে।"

"বিপদ?"

"হ্যাঁ।"

"কার বিপদ?"

"তোর বিপদ।"

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "আমার?"

"হ্যাঁ। তুই যদি বিপদকে ভয় না পাস, তাহলে কালকেই বের করে দেব। কিন্তু পরে আমাকে দোষ দিতে পারবি না। রাজি?"

টুম্পা রাজি হলো।

পরদিন সকালে টুম্পা স্কুলে যাওয়ার সময় টুনি তাকে থামাল। জিজ্ঞেস করল, "টিফিন নিয়েছিস?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"কী টিফিন?"

"নুডলস।"

"এটা কি চুরি হবে?"

"মনে হয়। নুডলস নিলেই চুরি হয়। চোর মনে হয় নুডলস খেতে খুব পছন্দ করে।"

"গুড।" টুনি হাত পেতে বলল, "দে তোর টিফিনের প্যাকেট।"

"কেন?"

"কোনো প্রশ্ন করবি না। তুই দে।"

টুম্পা তার ব্যাকপ্যাক থেকে পলিথিনে মোড়া একটা প্লাস্টিকের বাটি বের করে আনল। টুনি সেটা হাতে নিয়ে বলল, "তুই দাঁড়া, আমি আসছি।"

"কী করবে তুমি আমার নুডলস নিয়ে।"

"কোনো প্রশ্ন করতে পারবি না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।"

টুম্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর টুনি নুডলসের বাটি নিয়ে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর সে আবার প্যাকেটটা নিয়ে বের হয়ে এল, সাথে দুটো খাম। নুডলসের প্যাকেট আর খাম দুটো টুম্পার হাতে দিয়ে বলল, "নে।"

"কী এগুলো!"

"যদি তোর নুডলস চুরি হয়, তাহলে পনেরো মিনিট পর এক নম্বর খামটা খুলবি। যদি কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে দুই নম্বর খামটা খুলতে হবে না, আমাকে বন্ধ অবস্থায় ফেরত দিবি।"

"কী আছে খামের ভেতরে?"

"তোর এখন জানার দরকার নাই। যদি তোর টিফিন চুরি হয়, শুধু তাহলে তুই জানতে পারবি।"

টুম্পা বলল, "ঠিক আছে।"

টুনি বলল, "আরও একটা কথা।"

"কী কথা?"

"তুই আজকে কাউকেই কিছু বলবি না। কোনো বন্ধুকে না, কোনো প্রাণের বন্ধুকে না। এমনকি তোর টিফিন নিয়ে তুই আজকে নিজের সাথেও কথা বলতে পারবি না।"

টুম্পা টুনির দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। নিজের সাথেও কথা বলা যাবে না সেটা কী ব্যাপার, টুম্পা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে টুনিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

স্কুলে গিয়ে টুম্পা তার ডেস্কের ওপর ব্যাগটা রেখে এদিক-সেদিক তাকাল, তার টিফিন চোর এর মাঝে চলে এসেছে কি না, কে জানে। টুনি আপু বলেছে, টিফিন চোর আজ ধরা পড়বে। কীভাবে ধরা পড়বে, সেটাই বা কে বলবে? পুরো ব্যাপারটা নিয়ে জিকুর সাথে আলাপ করতে হবে, কিন্তু টুনি আপু বলে দিয়েছে আজকে কোনো বন্ধু কিংবা প্রাণের বন্ধু কারোর সাথেই এটা নিয়ে কথা বলা যাবে না—কাজেই মনে হয়, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। টিফিন চোর ধরা পড়ার পর সেই চোরকে নিয়ে কী করা যায়, সেটা জিকুর সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

একটু পরই জিকু তার ব্যাগ ঝুলিয়ে চলে এল। পাশের ডেস্কে ব্যাগটা রেখে টুম্পাকে জিজ্ঞেস করল, "ইংরেজি হোমওয়ার্ক এনেছিস?"

টুম্পা মাথা নাড়ল, "এনেছি।"

"আর টিফিন?"

"টিফিনও এনেছি।"

"কী এনেছিস।"

"আম্মু নুডলস বানিয়ে দিয়েছে।"

জিকু মুখ শক্ত করে বলল, "আজকে তোর ব্যাগ কঠিনভাবে পাহারা দেব। দেখব, কেমন করে চুরি করে।"

টুম্পার মুখটা একবার বলার জন্য নিশপিশ করছিল যে আজ টিফিন চোর ধরা পড়বে, কিন্তু বলল না। টুনি আপু না করে দিয়েছে বলা ঠিক হবে না।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর টুম্পা তার টিফিন, টিফিন চোরের কথা ভুলে গেল। হাফ টাইমে টুম্পা তার ব্যাগটা চোখে চোখে রাখল। যখন সে ছিল না, তখন জিকু তার ব্যাগটা লক্ষ রাখল। টুম্পা ভেবেছিল, টিফিন চোর চুরি করার সুযোগ পায়নি, কিন্তু টিফিন পিরিয়ডে যখন ব্যাগ খুলল, তখন অবাক হয়ে দেখল, তার প্লাস্টিকের বাটিটা আছে কিন্তু নুডলস হাওয়া। কী আশ্চর্য ব্যাপার! টুম্পা যত অবাক হলো, জিকু অবাক হলো তার থেকে বেশি।

জিকু তার প্যাকেট খুলে রুটি আর ডালের অর্ধেকটা টুম্পাকে খেতে দিল। সেই রুটি আর ডাল দেখেই টুম্পার খিদে চলে গেল। রুটিটাকে দেখে মনে হলো, এটা বুঝি গুইসাপের চামড়া, আর ডালটাকে মনে হলো বিষাক্ত কেমিক্যাল। টুম্পা খেতে রাজি হলো না বলে জিকু একা একাই মুখ কালো করে তার গুইসাপের চামড়া চিবুতে লাগল।

টুনি আপু বলেছিল, ঠিক পনেরো মিনিট পর প্রথম খামটা খুলতে। টুম্পা ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে খামটা খুলল। ভেতরে দুটি কাগজ, একটা হাতে লেখা অন্যটা টাইপ করা। হাতে লেখা কাগজটা টুনির হাতে লেখা। সেখানে লেখা আছে

টুম্পা

তোর মনে আছে, আমি তোর নুডলসের বাটিটা কিছুক্ষণের জন্য ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম? তখন আমি একটা কাজ করেছি, তোর নুডলের ওপর কয়েক ফোঁটা গাইকো ফ্লেরাক্সিন থার্টি টু দিয়ে দিয়েছি। এটা একধরনের কেমিক্যাল, পশু-ডাক্তাররা অবাধ্য গরু-ছাগলকে বশ করার জন্য এটার ইনজেকশন দেয়। মানুষ খেলে তার ভয়ংকর একধরনের রি-অ্যাকশন হয়, তিন থেকে চার ঘণ্টা এটার প্রতিক্রিয়া থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যায়।

কাজেই তুই এখন তোর ক্লাসের সব ছেলেমেয়েকে লক্ষ করে দেখ, কে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছোটখাটো অসুস্থ নয়, খুব খারাপভাবে অসুস্থ। বমি এবং মাথা ঘোরা। হাত-পায়ে কাঁপুনি ইত্যাদি ইত্যাদি। গাইকো ফ্লেরাক্সিন থার্টি টু কী ধরনের কেমিক্যাল, সেটা বোঝানোর জন্য ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে একটা পৃষ্ঠা দিয়েছি। ইচ্ছে করলে পড়ে দেখতে পারিস।

দেরি করবি না, তোর হাতে কিন্তু সময় বেশি নাই।

টুনি আপু
আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।
অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভ।

চিঠি পড়ে টুম্পার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সর্বনাশ! টুনি আপু কী ভয়ংকর একটা কাজ করেছে, টিফিন চোর ধরার জন্য তার টিফিনে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। টুম্পা আতঙ্কিত হয়ে চারদিকে তাকাল। দেখার চেষ্টা করল কেউ বমি করছে কি না, মাথা ঘুরে পড়ে গেছে কি না।

জিকু জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ হয়েছে।"

"কী সর্বনাশ হয়েছে?"

টুম্পা কাঁপা গলায় বলল, "টিফিন চোর ধরার জন্য টুনি আপু আমার টিফিনে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।"

জিকু চিৎকার করে বলল, "কী বললি?"

"হ্যাঁ। এই দেখ।" টুম্পা জিকুকে চিঠিটা দেখাল, জিকু চিঠিটা পড়ল এবং টুম্পা দেখল, চিঠি পড়তে পড়তে জিকুর হাত কাঁপতে শুরু করেছে। চোখ-মুখ কেমন যেন লালচে হয়ে উঠছে, আর সেখানে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। জিকুর চেহারা দেখে হঠাৎ করে টুম্পার মাথায় ভয়ংকর একটা চিন্তা খেলে যায়। তাহলে কী—

জিকু কাঁপা হাতে বাংলায় টাইপ করা দুই নম্বর কাগজটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কাগজে লেখা

> গাইকো ফ্রেরাক্সিন থার্টি টুয়ের বিষক্রিয়া
>
> এটি প্রথমে পাকস্থলীর মাংসপেশিকে আক্রমণ করে। রক্তের সাথে মিশে যাওয়ার পর পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাঝে এর বিষক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণ প্রতিক্রিয়া মাথা ঘোরা, বমি, অবসাদ ও খিঁচুনি। শরীরের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়। বিষের প্রতিক্রিয়া চলাকালে টানেল ভিশন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
>
> শিশু ও কিশোরদের ভেতর এর প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। সাময়িকভাবে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। শরীর থেকে ঘাম নির্গত হয়। পিঠ ও পাঁজরে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। আঙুলের গোড়ায় স্পর্শানুভূতি লোপ পায়।
>
> আক্রান্ত রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে স্থানান্তর করা জরুরি। একই সাথে স্যালাইন ও কোরামিন প্রদান করে অপেক্ষা

করা ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত রোগীর মনোবল রক্ষার জন্য তাকে সাহস দিয়ে আশ্বস্ত রাখা জরুরি। এই বিষক্রিয়ার কারণে এখন পর্যন্ত কোনো মৃত্যুর ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই।

জিকু পুরোটা পড়তে পারল না, তার আগেই তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে, পাঁজর ও পিঠে ভয়ংকর ব্যথা শুরু হয়। তার হাত কাঁপতে থাকে আর মোটামুটি শব্দ করে সে বেঞ্চের ওপর পড়ে যায়। তার মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে একধরনের শব্দ হতে থাকে।

টুম্পার টিফিন এত দিন কে চুরি করে এসেছে, সেটা বুঝতে টুম্পার বাকি নাই, কিন্তু এই মুহূর্তে তার সেটা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নাই। জিকুকে হাসপাতালে কীভাবে নেওয়া যাবে, সেটাই হচ্ছে চিন্তা।

ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে মিশু আর সবচেয়ে পাঁজি মেয়ে পিংকি সবার আগে ছুটে এল, জিকুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে জিকুর?"

টুম্পা বলল, "বি-বিষ খেয়েছে।"

দুষ্টু ছেলে মিশু চোখ কপালে তুলে বলল, "বিষ? বিষ কোথায় পেল? কেন বিষ খেল?"

"এখন এত কথা বলার সময় নাই," টুম্পা শুকনো গলায় বলল, "জিকুকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে হবে।"

"হাসপাতাল?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে নিবি?"

টুম্পা কাঁপা গলায় বলল, "স্যার-ম্যাডামদের বলতে হবে।"

সবচেয়ে পাঁজি মেয়ে পিংকী বলল, "তোরা অপেক্ষা কর, আমি স্যার-ম্যাডামদের ডেকে আনি।" বলে সে ছুটে বের হয়ে গেল।

জিকু যে রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে, টুম্পাও মনে হয় সে রকম অসুস্থ হয়ে পড়বে। টুনি আপু কেমন করে এ রকম ভয়ংকর একটা কাজ করল? স্যার-ম্যাডাম এসে যখন দেখবেন, সে টিফিনের মাঝে গাইকো ফ্রেরাক্সিন না কী যেন ভয়ংকর বিষ দিয়ে এনেছে, তখন তার কী অবস্থা হবে? তাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে না? এত বড় বিপদ থেকে সে কেমন করে রক্ষা পাবে?

ঠিক তখন টুম্পার মনে পড়ল, টুনি আপু দুটি খাম বন্ধ চিঠি দিয়েছে। তাকে বলে দিয়েছে, সে যদি বিপদে পড়ে, তাহলে যেন দুই নম্বর খামটা খোলে। এর থেকে বড় বিপদ আর কী হতে পারে? জিকু বেঞ্চে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সেই চোখে আতঙ্ক।

টুম্পা এর মধ্যে তার ব্যাগ থেকে দুই নম্বর খামটা বের করে সেটা খুলল, ভেতরে সাদা কাগজে বড় বড় করে লেখা

> পুরোটা ধাপ্পাবাজি।
> টিফিনে কোনো কেমিক্যাল দেওয়া হয় নাই।
> গাইকো ফ্লেরাক্সিন থার্টি টু বলে কিছু নাই।
> পুরোটাই বানানো।
>
> টুনি
> অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিটেকটিভ
> আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।

টুম্পা দুবার চিঠিটা পড়ে চিৎকার করে বলল, "আসলে জিকু বিষ খায় নাই। স্যার-ম্যাডামকে ডাকতে হবে না।"

সবচেয়ে পাঁজি ছেলেটা বলল, "ডাকতে হবে না? হাসপাতালে নিতে হবে না?"

"না। কিছু করতে হবে না। পিংকীকে থামা।"

পিংকীকে থামানোর জন্য মিশু গুলির মতো বের হয়ে গেল। শুধু সে-ই পিংকীকে সময়মতো থামাতে পারবে।

টুম্পা তখন জিকুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তোর কিছু হয় নাই। এই দেখ।"

জিকু বেঞ্চে শুয়ে একবার টুনির লেখা কাগজটা পড়ল। তারপর উঠে বসে আরেক বার কাগজটা পড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আরেক বার কাগজটা পড়ল। তারপর কথা নাই বার্তা নাই ধড়াম করে টুম্পার নাকের উপর একটা ঘুষি মেরে বসল।

টুম্পা এত অবাক হলো যে বলার নয়। তার টিফিন এত দিন চুরি করে খেয়ে এখন তাকেই মারছে? এর থেকে বড় অন্যায় আর কী হতে পারে?

তখন টুম্পাও ধড়াম করে জিকুর নাকে একটা ঘুষি মেরে দিল। তার মতো একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে এ রকম একটা কাজ করতে পারে, কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। টুম্পার ঘুষি খেয়ে জিকু তখন আরেকটা ঘুষি দিল, এবার টুম্পার পেটে। টুম্পা তখন জিকুর বুকে একটা ঘুষি দিল। জিকু তখন—

মিশু ততক্ষণে পিংকীকে ধরে নিয়ে এসেছে। তারা দুজন তখন টুম্পা আর জিকুকে ধরে সরিয়ে নিল। সরিয়ে নেওয়ার আগে টুম্পা জিকুর সাথে জন্মের আড়ি দিয়ে দিল। এ রকম অকৃতজ্ঞ বন্ধুর তার কোনো দরকার নেই।

টুনির সাথে বাসায় যখন টুম্পার দেখা হলো, টুনি তখন জিজ্ঞেস করল, "টিফিন চোর ধরা পড়েছে?"

টুম্পা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কে? জিকু?"

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"না জানার কী আছে। তোর মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকত, তাহলে তুইও জানতি।"

টুম্পা বলল, "জিকুর সাথে আমার জন্মের আড়ি হয়ে গেছে।"

টুনি চিন্তিত মুখে বলল, "তাই নাকি?"

টুম্পা কোনো উত্তর দিল না।

পরদিন টুম্পা যখন স্কুলে যাবে, তখন তার আম্মু তাকে দুটি টিফিনের বাক্স ধরিয়ে দিল। টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "দুইটা কেন?"

আম্মু বলল, "কী জানি। টুনি বলল, এখন থেকে প্রতিদিন তোকে যেন দুইটা করে টিফিন দিই।"

টুম্পা কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা ভাবল, তারপর দুটি টিফিনের প্যাকেটই হাতে নিল।

স্বীকার করতেই হবে লক্ষণটা ভালো।



ছোটাচ্চু শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকছিল। ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে, দাদির সাথে মোটাসোটা নাদুসনুদুস একজন মহিলা গল্প করছে। ছোটাচ্চু সাথে সাথে শিস বন্ধ করে সটকে পড়ার চেষ্টা করল। মোটাসোটা নাদুসনুদুস মহিলাদের সে খুব ভয় পায়। এ-রকম মহিলারা সাধারণত সবকিছু জানে এবং সবকিছু নিয়ে উপদেশ দিতে পছন্দ করে।

ছোটাচ্চু অবশ্যি সটকে পড়তে পারল না, শিস শুনে দাদি তাকে ডাকল, "এই শাহরিয়ার, কই যাস? ভিতরে আয়।"

ছোটাচ্চু তাই মুখ কাঁচুমাচু করে ভেতরে ঢুকল। ঘরের ফাঁক দিয়ে নাদুসনুদুস মহিলাটাকে যতটা ভয়ংকর মনে হচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারল মহিলাটা আরও ভয়ংকর। তার কারণ, মহিলাটি ফরসা, পরনে সিল্কের শাড়ি আর শরীরে নানা রকম গয়না। ঠোঁটে দগদগে লাল লিপস্টিক।

দাদি মহিলাটাকে বললেন, "এই যে ডলি, এইটা আমার ছোট ছেলে শাহরিয়ার।"

ডলি নামের মহিলাটা ন্যাকুন্যাকু গলায় বলল, "ও মা! এত বড় হয়েছে, শেষবার যখন দেখছি, তখন নাক দিয়ে সর্দি ঝরত—মনে আছে?"

কার মনে থাকার কথা ছোটাচ্চু বুঝতে পারল না। তাই ছোটাচ্চু মুখে একটা গাধা টাইপের হাসি ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাদি ছোটাচ্চুকে বললেন, "এই যে তোর ডলি খালা। ডলিদের পুরো ফ্যামিলি আমাদের খুব কাছের মানুষ।"

ছোটাচ্চু মনে মনে বলল, "কাছের মানুষ না কচু।" মুখে বলল, "ও আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। জি জি।"

ডলি নামের ভদ্রমহিলা বলল, "তুমি এখন কী করো?"

ছোটাচ্চু বলল, "এই তো পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়েছে। কিছু একটা করার প্ল্যান করছি।" ছোটাচ্চু বুঝতে পারল এ রকম নাদুসনুদুস টাইপের মহিলারা

আসলে ডিটেকটিভ এজেন্সির ব্যাপারটা বুঝতেই পারবে না। তাই সে কী শুরু করেছে, সেটা বলার ঝুঁকি নিল না।

দাদি বলল, "তোর ডলি খালার মেয়ের বিয়ে, তার খবর দিতে এসেছে।"

ছোটাচ্চু মনে মনে বলল, "খবর দিতে এসেছে তো খবর দিয়ে চলে যাও না কেন? বসে থাকার কী দরকার?" মুখে বলল, "ও আচ্ছা, তাই নাকি? ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

ডলি খালা বলল, "বিয়ে এখনো ফাইনাল হয় নাই। কথাবার্তা চলছে।"

ছোটাচ্চু মনে মনে বলল, "ফাইনাল হয় নাই তো সেমিফাইনাল শুরু করে দাও।" মুখে বলল, "ও আচ্ছা। হুঁ হুঁ। হাউ নাইস!"

ডলি খালা বলল, "ছেলে আমেরিকা থাকে। বিয়ে করার জন্য দেশে এসেছে। মেয়ে খুঁজছে।"

ছোটাচ্চু মনে মনে বলল, "মেয়ে আবার খোঁজে কেমন করে? মেয়েরা কি কোরবানির গরু নাকি যে বাজারে বাজারে খুঁজবে?" মুখে বলল, "আচ্ছা। হাউ নাইস! চমৎকার!"

দাদি বলল, "ডলি, বিয়ের কথা পাকাপাকি করার আগে ছেলে সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নাও। ছেলে আমেরিকা থাকলেই কিন্তু বিয়ের যোগ্য হয় না।"

ডলি খালা বলল, "হ্যাঁ, খোঁজ নিচ্ছি।"

দাদি বলল, "আমি শুনেছি, এক ছেলে আমেরিকা থাকে, লেখাপড়া জানা ইঞ্জিনিয়ার জেনে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। আমেরিকা গিয়ে আবিষ্কার করেছে, ছেলে ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে রাস্তা ঝাড়ু দেয়।"

ছোটাচ্চু বলল, "হয়তো ঝাড়ু ইঞ্জিনিয়ারিং।"

দাদি ধমক দিল। বলল, "ইয়ার্কি করবি না আমার সাথে।"

ছোটাচ্চু বলল, আমি মোটেই ইয়ার্কি করছি না।

আজকাল সবকিছুর ইঞ্জিনিয়ারিং বের হয়ে গেছে। ভোটের সময় রীতিমতো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়, শোনো নাই?"

ডলি খালা বলল, "ছেলে দেখতে-শুনতে ভালো। ফ্যামিলিও ভালো। ছেলের আত্মীয়স্বজন-পরিচিতদের কাছে খোঁজ নিয়েছি।"

"আত্মীয়স্বজনেরা তো ঠিক খবর দেবে না।" দাদি বলল, "অন্যদের কাছে খোঁজ নাও।"

ডলি খালা বলল, "বুবু, অন্য কার কাছে খোঁজ নেব? আমাদের দেশে তো আর এসবের জন্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নাই।"

দাদির তখন হঠাৎ করে ছোটাচ্চুর ডিটেকটিভ এজেন্সির কথা মনে পড়ল। ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? তুই না ডিটেকটিভ এজেন্সি দিয়েছিস। তুই খোঁজ নিয়ে দিতে পারবি না?"

ডলি খালা অবাক হয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই নাকি? তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে?"

ছোটাচ্চুর তখন বলতেই হলো, "জি। আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি। মনে হয়, দেশের প্রথম প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।"

ডলি খালা চোখ বড় বড় করে বলল, "বাহ্! কী চমৎকার! সেই দিনের বাচ্চা ছেলের এখন নিজের প্রাইভেট এজেন্সি? কংগ্রাচুলেশন।"

ছোটাচ্চু প্রশংসা শুনে একটু নরম হলো। ডলি খালা মানুষটাকে তার এখন বেশ বুদ্ধিদীপ্ত আর আধুনিক মানুষ মনে হতে লাগল। ঠোঁটের লিপস্টিকটাও তখন আর বেশি দগদগে মনে হল না। ডলি খালা বলল, "তোমরা কী করো? কীভাবে কাজ করো?"

"ওয়েবসাইটে ক্লায়েন্টরা যোগাযোগ করে। আমাদের টিম তখন কাজে লেগে যায়।" ছোটাচ্চু অবশ্যি জানাল না যে তার টিম মানে সে একা এবং জোর করে সেখানে টুনি ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করছে।"

"কী রকম ক্লায়েন্ট পাচ্ছ?"

"বেশ ভালো। নতুন প্রজেক্ট হিসেবে বেশ ভালো।" ছোটাচ্চু এবারেও জানাল না যে ডলি খালা যে খোঁজ নিচ্ছে, এটাই তার এজেন্সির সম্পর্কে প্রথম কারও আগ্রহ এবং সে জন্যই সে বলছে বেশ ভালো। ছোটাচ্চু চোখের কোনা দিয়ে আশপাশে তাকাল—ভাগ্যিস আশপাশে ছোট বাচ্চারা নেই, থাকলে এতক্ষণে তার সবকিছু প্রকাশ হয়ে যেত।

ডলি খালা এবার বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, "তাহলে তুমি তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সি দিয়ে আমার জামাইয়ের খোঁজ নিয়ে দাও না ছেলেটি কেমন।"

ছোটাচ্চু তখন মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে এল। সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে, ডলি খালা তার ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সত্যি সত্যি একটা কাজ দিচ্ছে। ছোটাচ্চুর মনে হলো, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, তার বুকে দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হলো। ছোটাচ্চু তখন কাঁপা কাঁপা গলায়

বলল, "অবশ্যই, ডলি খালা। আমার ডিটেকটিভ এজেন্সি আপনার জামাইয়ের খোঁজ নিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ডলি খালা খুশি হয়ে বলে, "থ্যাংকু বাবা। বুঝতেই পারছ একটা মাত্র মেয়ে, কার হাতে তুলে দিই সেইটা নিয়ে অশান্তি।"

ছোটাচ্চু গম্ভীর গলায় বলল, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আপনার কেসটা আমরা খুব সিরিয়াসলি নেব।" ছোটাচ্চু কথাটা শেষ করেও শেষ করল না—তার ডিটেকটিভ এজেন্সির একটা ফি আছে, সেই ফিয়ের কথাটা কেমন করে তুলবে, ছোটাচ্চু বুঝতে পারছিল না। তাই মুখটা একটু খোলা রেখে ডলি খালার দিকে তাকিয়ে রইল।

ডলি খালা মনে হয় যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে, ছোটাচ্চুর ইঙ্গিতটা ধরে ফেলল। বলল, "তোমার এজেন্সির কত ফি আমাকে বিল করে দিয়ো। আমি দিয়ে দেব।"

ছোটাচ্চু এবারে একেবারে গদগদ হয়ে বলল, "আপনারা আমাদের নিজের মানুষ, আপনাদের আমি হেভি ডিসকাউন্ট দেব। কিন্তু বুঝতেই পারছেন এত বড় একটা এস্টাবলিশমেন্ট, এটা চালাতে তো একটা খরচ আছে।"

ডলি খালা বলল, "তা তো বটেই। তা তো বটেই।"

ডলি খালা চলে যাওয়ার পর ছোটাচ্চু বাসার বাচ্চাকাচ্চাদের ডেকে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি যখন প্রথম আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছিলাম, তোরা ভেবেছিলি, এটা বুঝি একটা খেলা। এখন দেখলি যে এটা খেলা না? এটা সত্যিকারের এজেন্সি।"

শান্ত জানতে চাইল, "কেন? এটা সত্যিকারের এজেন্সি কেন?"

"আমার এজেন্সিতে কেস আসা শুরু হয়েছে।"

"সত্যি?" বাচ্চাকাচ্চারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। একজন জিজ্ঞেস করল, "কী কেস ছোটাচ্চু? মার্ডার কেস?"

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, "সিঙ্গেল মার্ডার, নাকি ডাবল মার্ডার?"

একজন একটু বড় হয়েছে, সে চকচকে চোখে জিজ্ঞেস করল, "নাকি সিরিয়াল কিলার? সবচেয়ে ফাটাফাটি হচ্ছে সিরিয়াল কিলার।"

আরেকজন বলল, "সিরিয়াল কিলার আর ড্রাগস?"

কয়েকজন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। ড্রাগস বিজনেসটাও ফাটাফাটি। ছোটাচ্চু, তোমার কি ড্রাগস বিজনেসের কেস এসেছে?"

"কী কী ড্রাগস, ছোটাচ্চু? হেরোইন নাকি ইয়াবা?"

ছোটাচ্চু একটু ইতস্তত করে বলল, "সে রকম কিছু না। প্রথম কেসটা এসেছে একজনের ক্যারেক্টার প্রোফাইল বের করা নিয়ে।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "ক্যারেক্টার প্রোফাইল মানে কী?"

শান্ত বলল, "মানুষটা ভালো না খারাপ, সেটা বের করা।"

বাচ্চাগুলো একসাথে ফোঁস করে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একজন বলল, "এইটা আবার কী রকম কেস।"

আরেকজন বলল, "ফালতু। ফালতু।"

আরেকজন বলল, "এই কেস নিয়ো না ছোটাচ্চু। মার্ডার কেস ছাড়া কোনো কেস নিয়ো না।"

আরেকজন বলল, "মার্ডার আর ড্রাগস বিজনেস।"

ছোটাচ্চু ঘাড় শক্ত করে বলল, "আমি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছি, আমাকে সব রকম কেস নিতে হবে। আমি কি একটা ভালো ক্লায়েন্টকে ফিরিয়ে দেব? সব ডিটেকটিভকে এ রকম কাজ করতে হয়। একজন মানুষ কী রকম সেটা বের করতে হয়।"

শান্ত ঠোঁট উল্টে বলল, "নিশ্চয়ই কেউ বিয়ে করবে। সেই জন্য খোঁজ নিচ্ছে।"

বাচ্চাগুলো তখন একসাথে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। বলল, "বিয়ে। হায় খোদা। কী বেইজ্জতি। ছ্যা ছ্যা।"

ছোটাচ্চু এবারে গরম হয়ে গেল। বলল, "কেন, বিয়ে দেওয়ার আগে মানুষ, ছেলেটা না হলে মেয়েটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারে না?"

বাচ্চাগুলো একসাথে আবার তাচ্ছিল্যের শব্দ করল। একজন বলল, "তার মানে আসলেই তুমি বিয়ের জামাইয়ের খোঁজ নিচ্ছ!"

শান্ত, যে সব সময়েই ত্যাঁদড় টাইপের, সে বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি একটা কাজ করো। তুমি ডিটেকটিভ এজেন্সির বদলে ঘটকালি এজেন্সি খুলে ফেলো। নাম দাও দি আলটিমেট ঘটকালি এজেন্সি।"

শান্তর কথা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে লাগল আর ছোটাচ্চু যেভাবে রেগে উঠল, সেটা আর বলার মতো নয়।

অন্য সব বাচ্চার সাথে টুনিও দাঁড়িয়ে ছিল। বাচ্চারা যখন ছোটাচ্চুকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল, তখন টুনি একটুও হাসল না, মুখ গম্ভীর করে

দাঁড়িয়ে রইল। হাসাহাসি শেষ করে যখন সবাই চলে গেল, তখন টুনি ছোটাচ্চুকে বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি মন খারাপ কোরো না। তোমার কেসটা ভালো কেস।"

ছোটাচ্চু গর্জন করে বলল, "একশবার ভালো কেস।"

"মার্ডার কেস থেকে কঠিন কেস?"

ছোটাচ্চু আরও জোরে গর্জন করে বলল, "একশবার মার্ডার কেস থেকে কঠিন কেস।"

"কীভাবে শুরু করব ঠিক করেছ?"

ছোটাচ্চু তখন আগের থেকে আরও জোরে গর্জন করে বলল, "সেটা আমার তোকে বলতে হবে কেন?"

টুনি বলল, "মনে নাই, আমি তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন পর্যন্ত তোমার যতগুলো কেস করা হয়েছে, সব আমি করে দিয়েছি।"

ছোটাচ্চু তখন আরও জোরে গর্জন করার চেষ্টা করে শেষ মুহূর্তে থেমে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কীভাবে আগাবো সেটা এখনো ঠিক করিনি।"

"মানুষটার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ছবি আছে?"

"শুধু নাম আর টেলিফোন নম্বর আছে।"

টুনি বলল, "নাম আর টেলিফোন নম্বর থাকলেই হবে। অন্য সবকিছু বের করে নেওয়া যাবে।"

ছোটাচ্চু কোনো কথা না বলে চোখ দিয়ে আগুন বের করতে করতে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল।

টুনি সেটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, "তুমিও চিন্তা করো কীভাবে আগানো যায়, আমিও চিন্তা করি কীভাবে আগানো যায়।"

ছোটাচ্চু তখন কোনো কথা বলল না, চোখ থেকে শুধু একটু বেশি আগুন বের হলো।

সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে একটু উঁকি দিয়ে গেল। সাধারণত ছোটাচ্চু অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায় কিন্তু টুনি দেখল, আজকে ছোটাচ্চু ঘরে নেই। খোঁজ নিয়ে জানল, ছোটাচ্চু নাকি অনেক ভোরে বের হয়ে গেছে।

টুনি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল, ছোটাচ্চু এখনো ফেরেনি। টুনি হাত-মুখ ধুয়ে খেতে খেতে ছোটাচ্চু ফিরে এল। সে মহা উত্তেজিত। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী খবর, ছোটাচ্চু?"

"মেজর ব্রেক থ্রু।"

"কী হয়েছে?"

"ডলি খালার জামাইয়ের ঠিকানা বের করে ফেলেছি। কাল থেকে ফলো করা শুরু করব। দেখব সারাদিন কী করে, কোথায় যায়।"

টুনি বলল, "ও আচ্ছা।" ঠিকানা বের করা নিয়ে ছোটাচ্চু এত উত্তেজিত কেন বুঝতে পারল না। ডলি খালাকে জিজ্ঞেস করলেই নিশ্চয় বলে দিত।

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে বের করেছি জানতে চাস?"

"বলো।"

"ভেরি স্মার্ট।" ছোটাচ্চু নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলল, "এই মাথা থেকে বের হয়েছে। ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!"

টুনি ধৈর্য ধরে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু তার ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়ার কথা বলতে শুরু করল, "আমি মানুষটাকে ফোন করলাম। ফোন করে বললাম, আমি একটা অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে ফোন করছি একটা জরিপ নেওয়ার জন্য। মানুষটা জিজ্ঞেস করল, কিসের জরিপ। আমি বললাম শ্যাম্পুর। কী শ্যাম্পু ব্যবহার করে, সেটা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিলে তার টেলিফোনে পঞ্চাশ টাকা গিফট দেওয়া হবে। শুনে মানুষটা একটু অবাক হলো। বলল, সত্যি? আমি বললাম, একশ' ভাগ সত্যি। তখন মানুষটা জিজ্ঞেস করল, কী প্রশ্ন? আমি বললাম, আগে নাম-ঠিকানাটা নিতে হবে। তখন জিজ্ঞেস করলাম, নাম কী। মানুষটা বলল, ইশতিয়াক হাসান রনি। নামটা সঠিক। ডলি খালা বলেছে, তার জামাইয়ের নাম ইশতিয়াক হাসান। তখন জিজ্ঞেস করলাম ঠিকানা কী, ইশতিয়াক হাসান তখন ঠিকানা বলে দিল। ছোটাচ্চু তখন মাথায় টোকা দিয়ে আনন্দে হা হা করে হাসতে লাগল।

টুনি জিজ্ঞেস করল, "তারপর শ্যাম্পু নিয়ে প্রশ্ন করো নাই?"

"করেছি।"

"কী উত্তর দিল?"

"বলল, আমি বিদেশে থাকি। তাই এই দেশের শ্যাম্পু কখনো ব্যবহার করি না।"

"তারপর টেলিফোনে টাকা পাঠিয়েছ?"

"আমাকে বোকা পেয়েছিস? কাজ শেষ, টাকা পাঠাব কেন?"

"তোমার টেলিফোন নম্বরটা তো তার কাছে আছে।"

ছোটাচ্চু তখন তার মাথায় আরও জোরে জোরে কয়েকটা টোকা দিয়ে বলল, "আমাকে বোকা পেয়েছিস? আমি কি নিজের সিম ব্যবহার করেছি ভেবেছিস? করি নাই। দোকান থেকে কয়েকটা আলতু-ফালতু সিম কিনে রেখেছি। সেই সিম ঢুকিয়ে ফোন করেছি।"

টুনিকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো যে তার ছোটাচ্চুর বুদ্ধি আগের থেকে একটু বেড়েছে।

পরদিন সকালে আবার ছোটাচ্চু বের হয়ে গেল। বের হওয়ার সময় তার পোশাকটা হলো দেখার মতো, মাথায় বেসবল ক্যাপ, চোখে কালো চশমা, গলায় ঝোলানো বাইনোকুলার, প্যান্টের পকেটে টেপরেকর্ডার, বুকপকেটে কলমের মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরা। দেখে যেকোনো মানুষ বুঝতে পারবে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

টুনি স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল ছোটাচ্চু তার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে—টুনি আগে কখনো ছোটাচ্চুকে তার ঘরের দরজা বন্ধ করতে দেখেনি। সে দরজায় কয়েকবার টোকা দেওয়ার পর ছোটাচ্চু দরজা খুলল। টুনি ছোটাচ্চুর চেহারা দেখে রীতিমতো চমকে উঠল। একেবারে বিধ্বস্ত চেহারা। টুনি জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী হয়েছে, ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু মেঘস্বরে বলল, "কিছু হয় নাই।"

"তাহলে তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?"

"এ রকম দেখাচ্ছে কারণ, আজ সারাদিন আমি রোদের মাঝে পুরো ঢাকা শহর চষে ফেলেছি, কিন্তু ইশতিয়াক হাসানের দেওয়া ঠিকানা খুঁজে পাই নাই। ঢাকা শহরে সানসেট বুলোভার্ড নামে কোনো রাস্তা নাই।"

টুনি বলল, "সানসেট বুলোভার্ড?"

"হ্যাঁ।"

"সানসেট বুলোভার্ড তো হলিউডের একটা রাস্তা।"

ছোটাচ্চু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল, "হ-হ-হলিউড?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে ওই বদমাইশ জামাই আমার সাথে ইয়ার্কি করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কত বড় ধুরন্ধর দেখেছিস! তাকে এই দেশে আসতে দেওয়াই ঠিক হয় নাই। ঘাড় ধরে তাকে বের করে দেওয়া দরকার।"

"ছোটাচ্চু, তুমি ওকে ঠকিয়েছ। টাকা পাঠাবে বলে টাকা পাঠাও নাই। সেও তোমাকে ঠকিয়েছে, একটা ভুল ঠিকানা দিয়েছে। সমান সমান হয়ে কাটাকাটি হয়ে গেছে।"

"আমি এক্ষুনি ডলি খালাকে ফোন করে বলব, তার জামাই মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা বলে বেড়ায়। কেস কমপ্লিট।"

টুনি মাথা নাড়ল। বলল, "উঁহু ছোটাচ্চু। আসলে উল্টোটা সত্যি। মানুষটার বুদ্ধি আছে। উল্টোপাল্টা জায়গায় সত্যিকারের ঠিকানা দেয় নাই। মানুষটা মজার মানুষ, তাই হলিউডের ঠিকানা দিয়েছে—তুমি বুঝতে পার নাই, এইটা তোমার সমস্যা।"

অন্য যেকোনো সময় হলে ছোটাচ্চু মনে হয় এই কথা শুনে চিড়বিড় করে জ্বলে উঠত, কিন্তু এখন তার মুড খারাপ, তাই জ্বলে উঠল না, বরং বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মনে হয় ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলাই ঠিক হয় নাই। আমার মনে হয় কন্ট্রাক্টরি করা উচিত ছিল।"

টুনি খুব বেশি হাসে না, কিন্তু ছোটাচ্চুর কথা শুনে একটু হাসল। বলল, "ছোটাচ্চু, কন্ট্রাক্টরি করলে তুমি আরও বড় সমস্যায় পড়বে। সবাই তোমাকে ঠকিয়ে তোমার বারোটা বাজিয়ে দেবে। ডিটেকটিভের কাজটাই ঠিক আছে।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "তুই সত্যি করে বলছিস?"

"হ্যাঁ। ছোটাচ্চু, সত্যি করে বলছি।"

তখন ছোটাচ্চুর একটু মন ভালো হলো। বিছানায় পা তুলে বসে বলল, "কিন্তু এই ইশতিয়াক হাসানের বাসার ঠিকানাটি যে কেমন করে বের করি।"

টুনি বলল, "তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি সেটা জোগাড় করে রেখেছি।"

"জোগাড় করে রেখেছিস?" ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "কীভাবে?"

টুনি বলল, "কেন? খুবই সোজা। দাদির কাছে ডলি খালার নম্বর আছে। দাদিকে দিয়ে ফোন করিয়ে জেনে নিয়েছি।"

"ফোন করিয়ে জেনে নিয়েছিস?" মনে হলো ছোটাচ্চু কথাটা বুঝতেই পারছে না।

"হ্যাঁ, ডলি খালা জানতে চাইল, আরও কিছু লাগবে নাকি। আমি বললাম, একটা ফটো হলে ভালো হয়। তোমার ডলি খালা ইশতিয়াক হাসানের একটা ছবি তোমার ই-মেইলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"এত সহজে?"

টুনি কথা না বলে একটু কাঁধ ঝাঁকালো। ছোটাচ্চুর বিধ্বস্ত ভাবটা কেটে তখন তার মধ্যে একটু উৎসাহ ফিরে এল। ছোটাচ্চু দাঁড়িয়ে ঘরের এই মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে গেল, তারপর বলল, "ঠিকানাটা দে দেখি, আমি ইশতিয়াকের বাসাটা দেখে আসি।"

টুনি বলল, "যদি যেতেই চাও, তাহলে ই-মেইলে ছবিটা দেখে যাও, তা না হলে তো তুমি চিনতেই পারবে না।"

"ঠিক বলেছিস।" বলে ছোটাচ্চু তার স্মার্টফোনটা টেপাটেপি শুরু করল।

ছোটাচ্চু সত্যিকারের ঠিকানাটা দিয়ে খুব সহজেই বাসাটা খুঁজে বের করে ফেলল। ধানমণ্ডিতে একটা দোতলা বাসা। বাসার সামনে লেখা, "কুকুর হইতে সাবধান'। কাজেই ভেতরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। বাসাটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না, তাই সে একবার হেঁটে গিয়ে আবার হেঁটে ফিরে এল। তারপর একটু দূরে একটা টংয়ের সামনে গিয়ে পায়েসের মতো এক কাপ চা খেল। তারপর আবার বাসার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল—এভাবে কতবার হেঁটে যেতে হবে, কে জানে। কেউ যদি তাকে লক্ষ করে, তাহলে নিশ্চয়ই মনে করবে, তার কোনো একটা বদ মতলব আছে। ছোটাচ্চু আবার যখন বাসার সামনে দিয়ে হেঁটে ফিরে এল, তখন হঠাৎ বাসার গেট খুলে সাদা রঙের একটা গাড়ি বের হয়ে এল, গাড়ির পেছনে একজন মানুষ বসে আছে, দেখেই ছোটাচ্চু চিনতে পারল, মানুষটা ইশতিয়াক হাসান।

ছোটাচ্চু কী করবে বুঝতে পারল না, গাড়ির পেছনে পেছনে সে তো আর দৌড়াতে পারে না। গাড়ি তো এক্ষুনি হুশ করে বের হয়ে যাবে। ছোটাচ্চুর কপাল ভালো ঠিক তখন কোথা থেকে জানি একটা খালি সিএনজি হাজির হলো। ছোটাচ্চু হাত দেখাতেই সেটা থেমে গেল। ছোটাচ্চু কোনো কথা না বলে লাফ দিয়ে সিএনজির ভেতরে উঠে বলল, "চলেন।"

সিএনজির ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

"সামনে। ওই যে সাদা গাড়িটা, তার পেছনে।"

"গাড়ির পেছনে কেন যেতে হবে? আপনি কই যাবেন, আপনি জানেন না?"

"না। জানি না। ওই গাড়িতে যে আছে, সে জানে।"

"তাহলে আপনি ওই গাড়িতে কেন গেলেন না? গাড়িতে তো জায়গা আছে।"

ছোটাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলল, "কথা কম বলে আপনি স্টার্ট দেন দেখি।"

সিএনজির ড্রাইভার আরও বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনার মতলবটা কী? একটা গাড়ির পেছনে পেছনে কেন যেতে চান? আপনি কি হাইজ্যাকার নাকি?"

"আমি কেন হাইজ্যাকার হব? ওই গাড়িতে যে মানুষটা আছে, সে কোথায় যায়, আমার জানা দরকার।"

"কেন?"

"কারণ, আমি একজন ডিটেকটিভ।"

সিএনজির ড্রাইভারের মুখে এবারে বিশাল একটা হাসি ফুটল। সে বলল, "আপনি টিকটিকি, সেইটা তো আগে বলবেন।"

"আমি টিকটিকি বলি নাই।"

"বলেন নাই তো কী হইছে। আমরা আপনাগো টিকটিকি বলি।" বলে সিএনজির ড্রাইভার দূরে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া গাড়িটার পেছনে পেছনে রওনা দিল। যেতে যেতে সে ছোটাচ্চুর সাথে বিশাল একটা গল্প জুড়ে দিল, এই রকম আরেকবার একজন টিকটিকিকে নিয়ে সে কীভাবে বিশাল এক সন্ত্রাসীকে ধাওয়া করেছিল, তার রোমহর্ষক গল্প।

ইশতিয়াকের গাড়ি ধানমণ্ডি থেকে আজিমপুরের একটা বাসা, সেখান থেকে মতিঝিলের একটা অফিস, সেখান থেকে ট্রাফিক জ্যামের ভেতর দিয়ে বনানীর একটা দোকান, সেখান থেকে আরও কঠিন ট্রাফিক জ্যামের ভেতর দিয়ে যখন উত্তরার দিকে রওনা দিল, তখন ছোটাচ্চু হাল ছেড়ে দিল। প্রথমত ইশতিয়াক হাসানের কাজকর্মে কোনো সন্দেহজনক কিছু নেই, দ্বিতীয়ত সিএনজির ড্রাইভার এতক্ষণে কত টাকা ভাড়া হয়েছে, সেটা যখন ছোটাচ্চুকে জানাল, তখন ছোটাচ্চু বুঝতে পারল, তার নেমে যাওয়ার সময় হয়েছে।

রাত্রিবেলা টুনি যখন ছোটাচ্চুর খোঁজ নিতে গেল, সে দেখল ছোটাচ্চু খুব মনমরা হয়ে বিছানায় পা তুলে বসে আছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী খবর, ছোটাচ্চু?"



"ইশতিয়াক হাসানকে ফলো করেছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু কতক্ষণ ফলো করব। কত টাকা সিএনজি ভাড়া হয়েছে জানিস?"

"কত?"

"ছয়শ' টাকা চেয়েছিল। অনেক দরদাম করে পাঁচশ' টাকা দিয়ে এসেছি।"

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, "পাঁচশ' টাকা?"

ছোটাচ্চু মনমরা হয়ে বলল, "হ্যাঁ। এত টাকা কোথা থেকে দেব? আমি পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর সে যদি কিছু না করে, তাহলে আমার কী লাভ? মানুষজন এত বোরিং কেন? তারা কিছু করে না কেন? যত্তসব।"

টুনির মাথায় একটা আইডিয়া এসেছিল, কিন্তু ছোটাচ্চুর মেজাজ দেখে সেটা এখন আর বলল না। কাল ছুটির দিন আছে সকালবেলা বললেই হবে।

সকালবেলা ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে দেখে, ছোটাচ্চুর মেজাজ খুব ভালো। তার কারণ, ছোটাচ্চুর ক্লাসের মেয়ে ফারিহা তার সাথে দেখা করতে এসেছে। ফারিহা মাঝেমধ্যেই আসে, তাই তার সাথে এই বাসার অনেক বাচ্চাকাচ্চারই পরিচয় আছে। টুনিকে দেখে ফারিহা মুখ হাসি হাসি করে বলল, "কী খবর ডিটেকটিভ টুনি? তোমাদের আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কাজ কেমন চলছে?"

টুনি কোনো উত্তর না দিয়ে মুখটা একটু হাসি হাসি করে দাঁড়িয়ে রইল, উত্তর দিল ছোটাচ্চু। বলল, "বেশি ভালো না। কালকে সিএনজি ভাড়া দিয়েছি পাঁচশ' টাকা।"

ফারিহা চোখ কপালে তুলে বলল, "পাঁচশ' টাকা? তোমার টাকাপয়সা বেশি হয়েছে?"

ছোটাচ্চু বলল, "এখনো হয় নাই। এখন যে কেসটা নিয়ে কাজ করছি, সেটা ঠিক করে করতে পারলে আমাদের প্রথমবার একটা ইনকাম হবে।"

ফারিহা বলল, "দিনে পাঁচশ' টাকা করে সিএনজি ভাড়া দিলে অবশ্যি ইনকাম শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না দেখো।"

ছোটাচ্চু মুখটা ভোঁতা করে মাথা নাড়ল। ফারিহা জিজ্ঞেস করল, "কেসটা কী?"

"একজন মানুষ আমেরিকা থেকে এসেছে, তার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়ের মা জানতে চাইছে ছেলেটা ভালো না বদ।"

ফারিহা মুখটা সুচালো করে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর বলল, "এটা তো রীতিমতো জটিল কেস। সেই লোকটার আগে-পিছে কিছু জানো?"

"না।"

"তাহলে কীভাবে বের করবে? সেই লোকটাকে যারা চেনে, তাদের কাছে তোমার যেতে হবে। তাদের চেনো?"

"না।"

"লোকটা কোথায়, কবে লেখাপড়া করেছে জানো?"

"না।"

"কোথায় চাকরি করে জানো?"

"না।"

ফারিহা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে তুমি কেমন করে বের করবে? ওর পেছনে পেছনে সিএনজি দিয়ে ঘুরে বেড়ালে জানতে পারবে? কিছুই জানতে পারবে না। কোনোদিন বের করতে পারবে না।"

টুনি বলল, "আমার একটা আইডিয়া আছে।"

অন্য যেকোনো সময় হলে বড়দের কথার মাঝখানে কথা বলার জন্য ছোটাচ্চু নিশ্চয়ই টুনিকে একটা রামধমক দিত। এখন ফারিহার সামনে সেটা দিল না, শুধু মুখটা কঠিন করে ভুঁরু কুঁচকে বলল, "কী আইডিয়া?"

"লোকটা যদি খারাপ কিছু করে তাহলে সে খারাপ। তাকে খারাপ একটা কিছু করতে বলে দেখো, সে রাজি হয় কি না। যদি রাজি হয়, তাহলে বুঝতে পারবে যে লোকটা আসলে খারাপ।"

ফারিহা হাতে কিল দিয়ে বলল, "ওয়ান্ডারফুল! তারপর দুই হাত ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "স্টিং অপারেশন।"

টুনি স্টিং অপারেশন মানে কী বুঝতে পারল না, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "তুই বলছিস, আমরা ইশতিয়াক হাসানের ওপর স্টিং অপারেশন চালাব?"

স্টিং অপারেশন মানে কী পুরোপুরি না বুঝলেও টুনি একটু আন্দাজ করতে পারল, তাই সে মাথা নাড়ল।

ফারিহা বলল, "ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া। তোমার এখন সিএনজি করে এই লোকের পেছন পেছন সারা ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াতে হবে না। লোকটাকে

শুধু কয়েকটা খারাপ খারাপ অফার দিতে হবে। দিয়ে দেখো সে অফারগুলো নেয় কি না।"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকিয়ে বলল, "খারাপ অফার? আমি দেব?"

"হ্যাঁ। মনে করো তার কাছে ইয়াবা বিক্রি করার চেষ্টা করলে সে যদি কিনতে রাজি হয়, তার মানে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড।"

ছোটাচ্চুকে খুব উৎসাহী মনে হলো না, মাথা চুলকিয়ে বলল, "আমি তার কাছে ইয়াবা বিক্রি করতে যাব আর ওই লোক যদি ধরে আমাকে পুলিশে দিয়ে দেয়? আমেরিকার ডিম-গোশত খেয়ে তার ইয়া ইয়া মাসল।"

ফারিহা বলল, "তুমি কি সত্যি সত্যি বিক্রি করবে নাকি? ফোনে অফার দেবে।"

ছোটাচ্চু এবারে একটু উৎসাহী হলো। মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে। আউল-ফাউল সিম দিয়ে ফোন করলে ট্র্যাক করতে পারবে না।"

ফারিহা সোজা হয়ে বসে বলল, "করো ফোন।"

"এখন?"

"হ্যাঁ, এখন। দেরি করে লাভ কী?"

ছোটাচ্চু একটু ইতস্তত করছিল কিন্তু ফারিহা শুনল না। বাধ্য হয়ে ছোটাচ্চু তার ফোনে আউল-ফাউল সিম ঢুকিয়ে ফোন করার জন্য রেডি হলো। চোখের কোনা দিয়ে একবার টুনির দিকে তাকাল, বোঝাই যাচ্ছে টুনির সামনে ছোটাচ্চু ঠিক কথা বলতে চাইছে না, কিন্তু টুনি নড়ল না। বরং আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ফারিহার পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে গেল।

ফারিহা বলল, "লাউড স্পিকার অন দাও, আমরাও শুনি তোমার মক্কেল কী বলে।"

ছোটাচ্চু সেটাও করতে চাচ্ছিল না, কিন্তু টুনি বুঝতে পারল, ফারিহা যেটাই বলে, ছোটাচ্চুকে সেটাই শুনতে হয়। তাই লাউড স্পিকার অন করে ছোটাচ্চু টেলিফোনে ডায়াল করল এবং একটু পরই প্রথমে খুট করে শব্দ হলো, তারপর ভারী একটা গলার স্বর শোনা গেল, "হ্যালো।"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যালো।"

অন্য পাশ থেকে এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, "হ্যালো।"

ছোটাচ্চুর কী হলো কে জানে। আবার বলে ফেলল, "হ্যালো।"

টেলিফোনের অন্য পাশ থেকে মানুষটি এবারে মহাখাপ্পা হয়ে বলল, "আপনার সমস্যাটা কী? সারাদিন কি হ্যালো হ্যালো করবেন, নাকি কে

ফোন করেছেন, কাকে ফোন করেছেন, কেন ফোন করেছেন, সেগুলো বলবেন?"

ছোটাচ্চু এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "বলব, অবশ্যই বলব। বলার জন্যই তো ফোন করেছি।"

"তাহলে বলে ফেলেন তাড়াতাড়ি।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি আপনাকে ফোন করেছি একটা অফার দিতে।"

"কিসের অফার? আমি এই দেশে থাকি না, আমার কেনাকাটা করার কিছু নাই।"

"এটা কেনাকাটার অফার না।" ছোটাচ্চু গলায় মধু ঢেলে বলল, "এটা হচ্ছে জীবনকে কানায় কানায় উপভোগ করার অফার।"

টেলিফোনের অন্য পাশের মানুষটা এবার মনে হয় একটু রেগে উঠল, বলল, "আমার জীবন উপভোগ করার জন্য আপনার কোনো অফারের দরকার নেই।"

"আহ্-হা, এত অস্থির হচ্ছেন কেন। আগে একটু শুনেই নেন অফারটা কী।"

"বলেন তাড়াতাড়ি।"

"আমার কাছে ইয়াবার একটা ফ্রেশ চালান এসেছে। মার্কেট প্রাইস প্রতি বড়ি চারশ' টাকা। আমি আপনাকে তিনশ' টাকায় দেব। পাইকারি রেট। এক নম্বর ইয়াবা।"

মানুষটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ইয়াবা জিনিসটা কী?"

ছোটাচ্চু একটু থতমত খেয়ে গেল, যে মানুষ ইয়াবা চেনে না, তার সাথে এখন কেমন করে কথা বলবে? একটু ইতস্তত করে বলল, "ইয়াবা হচ্ছে একধরনের ড্রাগস।"

অন্য পাশের মানুষটা হঠাৎ করে ছোটাচ্চুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "দাঁড়ান। এক সেকেন্ড দাঁড়ান।"

"কী হয়েছে?"

"আপনি কালকে আমাকে ফোন করেছিলেন না? কী একটা জরিপ করে বললেন পঞ্চাশ টাকা পাঠাবেন। শেষ পর্যন্ত পাঠাননি।"

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে বলল, "না না, আমি না।"

অন্য পাশ থেকে মানুষটা এবার গর্জন করে উঠল, বলল, "অফকোর্স আপনি। আমি গলার স্বর ভুলিনি। আপনার মতলবটা কী? আমার পেছনে কেন লেগেছেন?"

ছোটাচ্চু একেবারে হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "আপনার পেছনে লাগব কেন?"

মানুষটা এবারে রীতিমতো হুংকার দিয়ে বলল, "আমার সাথে রংবাজি করেন? আপনি ভেবেছেন আমি ঘাস খেয়ে বড় হয়েছি? আপনাকে ধরে পুলিশে দেওয়া দরকার। ধরে যখন পুলিশ কেচকি দেবে, আপনি তখন সিধে হয়ে যাবেন।"

ছোটাচ্চু দুর্বলভাবে বলল, "না, মানে ইয়ে—"

"আমার কাছে ডিসকাউন্ট প্রাইসে ড্রাগস বিক্রি করতে চান? আপনার সাহস তো কম না। সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বলেন, আমি যদি ঠেঙ্গিয়ে আপনার ঠ্যাং ভেঙে নুলা করে না দিই!"

ছোটাচ্চু একটু রেগে উঠে বলল, "আপনি কী ভাষায় কথা বলছেন?"

মানুষটা এবার আপনি থেকে তুমিতে নেমে এল, "তোমার সাথে আবার সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে? তুমি ড্রাগ বিক্রি করবে আর তোমার সাথে আমার মোলায়েম করে কথা বলতে হবে? আমাকে চিন তুমি? আমি যদি তোমার ঘাড় মটকে না দিই, মুণ্ডু ছিঁড়ে না ফেলি, ভুঁড়ি না ফাঁসিয়ে দিই, চোখ উপড়ে না ফেলি—"

ছোটাচ্চু এই সময় লাইনটা কেটে দিল। তার চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, হাত অল্প অল্প কাঁপছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, "ও মাই গুডনেস! কী ভায়োলেন্ট একজন মানুষ।"

ফারিহা বলল, "তবে একটা জিনিস নিশ্চিত হওয়া গেল। মানুষটা ড্রাগস খায় না।"

"তাই বলে এভাবে কথা বলবে?"

"তোমাকে কেউ ড্রাগস অফার করলে তুমিও এ রকম করতে।"

"কখনো না।" ছোটাচ্চু গলা উঁচিয়ে বলল, "নেভার। আমি কখনো এত অভদ্র হব না। আমার সাথে কী খারাপ ব্যবহার করল দেখলে?"

"মোটেও তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। একজন ড্রাগস ডিলার যে আগেও তাকে জ্বালাতন করেছে, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে।"

"তাই বলে এই ভাষায়?"

ফারিহা হাত নেড়ে পুরো বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়ার মতো ভান করল। ছোটাচ্চু মুখটা ভোঁতা করে বসে রইল। টুনি তখন বলল, "আর ফোন করবে না ছোটাচ্চু?"

"মাথা খারাপ? শুনলি না মানুষটা কী ভাষায় কথা বলে?"

"তাহলে কেমন করে তুমি রিপোর্ট লিখবে?"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকাল। বলল, "অন্য কাউকে দিয়ে ফোন করাতে হবে।"

"কাকে দিয়ে ফোন করাবে?"

ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ চিন্তা করে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে ফারিহার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি ফোন করবে।"

ফারিহা চোখ বড় বড় করে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ফোন করে কী বলব?"

"ড্রাগস হয়েছে। এখন বাকি আছে টাকাপয়সা। তুমি ফোন করে টাকাপয়সার লোভ দেখাও। দেখি কী বলে।"

"টাকাপয়সার লোভ? কেমন করে দেখাব?"

ছোটাচ্চু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "কিছু একটা বলো! তোমার কাছে গোপন খবর আছে যেটা ব্যবহার করলে অনেক টাকা পাবে, সে রকম কিছু একটা।"

ফারিহা কিছুক্ষণ ভাবল, হঠাৎ করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "পেয়েছি।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী পেয়েছ?"

"কী বলব সেটা। স্টক মার্কেটের কথা বলব।"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "গুড। বলো তাহলে।"

ফারিহা একটু অবাক হয়ে বলল, "এখনই বলব?"

"হ্যাঁ, সমস্যা কী?"

"এখনই ফোন করলে সন্দেহ করবে না?"

"করলে করবে। দেরি করে আমার লাভ কী? করো, ফোন করো।"

ছোটাচ্চু ফোনটা খুলে নতুন আরেকটা সিম ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, নতুন আরেকটা সিম ঢুকিয়ে দিলাম।"

ফারিহা ফোনটা হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে ইশতিয়াক হাসানকে ফোন করল। দু-তিনটে রিং হওয়ার পরই ইশতিয়াক হাসান ফোন ধরে ভারী গলায় বলল, "হ্যালো'।

ফারিহা বলল, "হ্যালো কামরুল, তোমার সাথে জরুরি কথা আছে।"

ইশতিয়াক বলল, "আমি তো কামরুল না।"

ফারিহা ভান করল সে লজ্জা পেয়ে গেছে, "ও আচ্ছা আপনি কামরুল না? আমি ভেবেছিলাম এটা কামরুলের নাম্বার! সরি, আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম।"

ইশতিয়াক হাসান গলায় রীতিমতো মধু ঢেলে বলল, "না, না, আপনি আমাকে একটুও ডিস্টার্ব করেননি। বরং আপনার ফোনটা পেয়ে খুব ভালো লাগছে! ধরে নিন আমি কামরুল।" বলে ইশতিয়াক আনন্দে হা হা করে হাসল।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, "ধরে নেব আপনি কামরুল?"

"হ্যাঁ। সমস্যা কী! কামরুলকে যেটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আমাকে বলতে পারেন।"

"সেটা বলতে পারি?"

"হ্যাঁ। অবশ্যই বলতে পারেন।"

ফারিহা বলল, "যদিও এটা গোপন বিষয়, আপনাকে বলার কথা না, কিন্তু আপনি যেহেতু জানতে চাইছেন বলেই দিই। স্টক মার্কেটে আমার লোক আছে, তার কাছ থেকে খবর পেয়েছি একটা কোম্পানি পাবলিক লিমিটেড হবে, তাই যদি আজ-কাল তার স্টক কেনা যায় এক সপ্তাহে সেটা দশ গুণ হয়ে যাবে। আপনি যদি জানতে চান, তাহলে কোম্পানিটার নাম বলতে পারি।"

ইশতিয়াক হাসান বলল, "থ্যাংকু। আসলে আমার জেনে কোনো লাভ নাই। জানার প্রয়োজনও নাই। আমার টাকাপয়সা মোটামুটি আছে, দিন চলে যায়। বেশি টাকা দিয়ে কী করব?"

ফারিহা বলল, "ঠিকই বলেছেন। প্রয়োজনের বেশি টাকা দিয়ে কী হবে? তাহলে রাখি। ভুল করে আপনার সাথে কথা হলো, ভালোই লাগল।"

ফারিহা টেলিফোনটা কেটে দিয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মক্কেল টাকা পরীক্ষায় পাস করেছে।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বসে রইল। টুনি বুঝতে পারল কোনো একটা কারণে ছোটাচ্চু রাগ করেছে, কারণটা কী অবশ্যি টুনি সাথে সাথে বুঝে গেল। কারণ ছোটাচ্চু হঠাৎ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "কত বড় ধান্দাবাজ দেখেছ? আমার সাথে গালাগাল ছাড়া কথা নেই, আর তোমার সাথে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা। আহা রে!"

ফারিহা হি হি করে হাসল, বলল, "এর জন্য তুমি রাগ করছ কেন? সব সময়ই তো ভদ্রমহিলাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলার নিয়ম। মেয়েদের একটু সম্মান করা উচিত না?

ছোটাচ্চু বলল, "এই লোকের ডলি খালার মেয়ের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে, এখন কেন সে তোমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে? হ্যাঁ?"

ফারিহা হাসি থামিয়ে বলল, "কী মুশকিল! একজনের সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারবে না? সে তো আমাকে ফোন করে নাই, ফোন করেছি আমি। আমি তো নিজ থেকে ফোন করি নাই, তুমি বলেছ তাই ফোন করেছি। এখন রাগ করছ কেন?"

ছোটাচ্চু কী একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন ফারিহার হাতে ধরে থাকা ফোনটা বেজে উঠল। এটা ছোটাচ্চুর বিখ্যাত আউল-ফাউল সিম, এর নম্বর কেউ জানে না। এইমাত্র ইশতিয়াক হাসানকে করা হয়েছে তাই শুধু ইশতিয়াক হাসানই এই নম্বরটা জানে। নিশ্চয়ই ইশতিয়াক হাসান ফোন করেছে। সবাই চোখ বড় বড় করে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। ফারিহা ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করব? ফোন ধরব?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "ইচ্ছে হলে ধরো। আরও একটু মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনো। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো।"

ফারিহা ফোনটা ধরল, "হ্যালো।"

"হ্যাঁ, এইমাত্র আপনার সাথে কথা বলছিলাম না?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র কথা বলেছি।"

"টেলিফোনটা রেখে আমার কী মনে হলো জানেন?"

"কী মনে হলো?"

"মনে হলো স্টক মার্কেট নিয়ে আপনার সাথে সামনাসামনি একটু কথা বললে কেমন হয়?

"সামনাসামনি?"

ইশতিয়াক হাসান সত্যি সত্যি মিষ্টি মিষ্টি করে বলল, "হ্যাঁ, ধরেন দুইজনে কোথাও বসে একটু কথা বললাম। একটু চা-কফি খেলাম।"

"চা-কফি?"

"হ্যাঁ।"

ফারিহা কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে ফোনটার দিকে তাকাল, তারপর ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, তারপর টুনির দিকে তাকাল। ছোটাচ্চু আর টুনিও ফারিহার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে, সে কী বলে শোনার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ফারিহা বলল, "হ্যাঁ, সেটা তো খেতেই পারি। কিন্তু ধরেন আপনাকে তো আমি চিনি না, তাই আপনার সম্পর্কে আমার তো একটু জানা দরকার। আপনি কি বিয়ে করেছেন?"

"না, বিয়ে করিনি।"

"তাহলে কি বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে?"

"না না, এখন বিয়ের কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। সে জন্যই তো মন-মেজাজ ভালো না। সেই জন্যই তো আপনার সাথে কথাবার্তা বলতে চাই। হে হে হে।"

ফারিহার চোখ আরও বড় হয়ে গেল, ছোটাচ্চু হাত দিয়ে ইশতিয়াক হাসানকে খুন করে ফেলার ভঙ্গি করল। হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল যেন টেলিফোনটা রেখে দেয়। ফারিহা টেলিফোনটা রাখল না বরং গলার স্বরে অনেক আনন্দের ভাব ফুটিয়ে বলল, "তাহলে তো দেখা করাই যায়। চা-কফি খাওয়াই যায়। কোথায় দেখা করব বলুন।"

"আপনি বলুন। আমি তো বিদেশে থাকি, এখানে কোথায় কী আছে ভালো করে চিনি না।"

ফারিহা বলল, "ঠিক আছে, ধানমণ্ডি এলাকায় নতুন একটা শপিং মল হয়েছে, খুব সুন্দর, সেখানে আসেন বিকেল চারটায়। ঠিকানাটা বলছি, তার আগে আপনাকে বলে দিই আমাকে খুঁজে বের করবেন কীভাবে। আমি লাল শাড়ি পরে আসব, সবুজ ব্লাউজ আর লাল টিপ। চুলে থাকবে বেলিফুল।"

ইশতিয়াক হাসান আনন্দে আটখানা হয়ে গেল, বলল, "গুড, গুড ভেরি গুড। ফ্যান্টাস্টিক।"

ফারিহা বলল, "আরও সহজ করে দিই। একটা পাসওয়ার্ড ঠিক করে নিই। আপনি বলবেন, "তোমাকে দেখে আমার তেঁতুলের কথা মনে পড়ছে।"

"তেঁতুল?" ইশতিয়াক হাসান, একটু অবাক হয়ে বলল, "তেঁতুল কেন বলব?"

ফারিহা বলল, "পাসওয়ার্ডের তো কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না। এটাও সে রকম, একটা কথার কথা। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

ফারিহা বলল, "এবার ঠিকানাটা বলে দিই।" তারপর ফারিহা ঠিকানাটা বলে দিল, নিচ তলায় কোথায় সে অপেক্ষা করবে সেটাও ইশতিয়াক হাসানকে বলে দিল।

টেলিফোনটা রাখার পর ছোটাচ্চু মেঘস্বরে বলল, "এইসবের মানে কী?"

"কোন সবের?"

"তুমি এই বদমাইশ লোকের সাথে দেখা করতে চাচ্ছ কেন?"

ফারিহা বলল, "যে মানুষ বিদেশ থেকে এসেছে বিয়ে করার জন্য, বিয়ে ঠিক হয়েছে, তার পরও সেটা গোপন করে অন্য মেয়ের সাথে চা-কফি খেতে চায়, তার চেহারাটা একটু দেখার ইচ্ছে করছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "তুমি লাল শাড়ি পরে চুলে বেলিফুল লাগিয়ে এর সাথে দেখা করতে যাবে—কাজটা ঠিক হচ্ছে?"

ফারিহা বলল, "জানি না।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যাই। শাড়ি-ব্লাউজ ইস্ত্রি করতে হবে। তুমি চাইলে চারটার সময় ধানমণ্ডির মলে আসতে পারো।"

"আমি?" ছোটাচ্চুর মুখ শক্ত হয়ে গেল, "আমি কেন যাব? তুমি সেজেগুঁজে চা-কফি খেতে যাচ্ছ, আমি সেখানে গিয়ে কী করব?"

ফারিহা বলল, "ঠিক আছে—না যেতে চাইলে নাই।" তারপর ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, "তুমি তোমার রিপোর্টটা ঠিক করে লেখো। মানুষটা ড্রাগস খায় না, টাকাপয়সার লোভ নাই, মনে হয় চেহারা ভালো, স্মার্ট, খুব সুন্দর করে কথা বলে, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু এই লোকের সাথে মেয়ে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।"

ফারিহা চলে যাওয়ার পর ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টুনিকে বলল, "টুনি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?"

"করো।"

"আমার এই বন্ধু ফারিহাকে তোর কেমন লাগে?"

"খুবই ভালো লাগে। ফারিহা আপু হচ্ছে সুপার ডুপার। ফ্যান্টাস্টিক।"

"ও।" ছোটাচ্চু আবার চুপ করে গেল।

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু।"

"উ।"

"তুমি আজকে বিকেলে ধানমণ্ডির মলে আমাকে নিয়ে যাবে?"

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ টুনির দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

চারটে বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি। ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের বাইরে রাখা টেবিলে বসেছে। টুনি একটা আইসক্রিম খাচ্ছে, ছোটাচ্চু খাচ্ছে ব্ল্যাক কফি। কফিটা তেতো, খেতে বিস্বাদ, পোড়া কাঠের মতো গন্ধ, প্রত্যেকবার চুমুক দেওয়ার পর ছোটাচ্চু মুখটা বিকৃত করছে, কিন্তু তার পরও খেয়ে যাচ্ছে। টুনি আইসক্রিমের একটা কোনা কামড় দিয়ে বলল, "ফারিহা আপু এখনো আসে নাই।"

কোনো একটা কারণে ছোটাচ্চুর মনটা একটু খারাপ, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দার্শনিকের মতো বলল, "বুঝলি টুনি, তোকে আর কী বলব, তুই তো সবই জানিস। আমি হচ্ছি অকাজের মানুষ। সবাই লেখাপড়া করে হাইফাই চাকরি করে, গলায় টাই লাগিয়ে অফিসে যায়, বড় বড় কাজ করে, তার চেয়ে বড় বড় কথা বলে। ইংরেজি আর বাংলা মিলিয়ে। আমি কিছুই করি না। আমার ফ্রি থাকার জায়গা আছে, ফ্রি খাওয়ার জায়গা আছে, তাই কোনো চিন্তা নাই। আমি তোদের জন্য ছাগল রং করে দিই। প্ল্যানচেট করে তোদের জন্য ভূত নামাই। মায়ের রাজাকার টাইপের খালাতো ভাইকে ভয় দেখাই। ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলি—তোর কি মনে হয় কোনো মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে?" ছোটাচ্চু টুনির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না, নিজেই বলল, "করবে না। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে এ রকম কোনো মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে না। করা উচিৎ না। কিন্তু—"

ছোটাচ্চু তার বিদঘুটে কালো কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, "কিন্তু ফারিহার কথা আলাদা। লেখাপড়ায় ভালো, চেহারা ভালো, খুবই স্মার্ট, বুদ্ধিমতী, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু আসলে মনটা খুবই নরম। এই রকম একটা মেয়ে আমাকে মনে হয় পছন্দই করে। আমি যদি বলি, মনে হয় আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। অনেক টাকা বেতনে চাকরি করবে, আমাকে খাওয়াবে, তোদের সাথে হইচই করবে।"

ছোটাচ্চু আবার তার কালো বিদঘুটে তিতকুটে কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, "কিন্তু আমি ফারিহাকে কিছু বলতে পারি না। কেন জানিস?"

"কেন?"

"ভয়ে।"

টুনি অবাক হয়ে বলল, "ভয়ে? ফারিহা আপুকে তোমার ভয় করে?"

"হ্যাঁ। করে। কারণটা কী জানিস?"

"কী?"

"ফারিহার মতো ডেঞ্জারাস মানুষ আমি জন্মেও দেখি নাই। তার মাথার মধ্যে যে কী ভয়ংকর প্ল্যান কাজ করে তুই চিন্তাও করতে পারবি না।"

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, "ফারিহা আপু ডেঞ্জারাস?"

'হ্যাঁ। যেমন ধর আজকের ব্যাপারটা। ফারিহা ওই পাঁজি মানুষটাকে এইখানে তার সাথে দেখা করতে বলেছে। ফারিহা বলেছে সে লাল শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, লাল টিপ, চুলে বকুল ফুল লাগিয়ে এখানে আসবে। সে এসেছে? না, আসে নাই। কিন্তু লাল শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, লাল টিপ আর চুলে বকুল ফুল লাগিয়ে কেউ কি এসেছে? হ্যাঁ এসেছে।"

"এসেছে?" টুনি চমকে উঠে বলল, "কোথায়?"

"ওই যে বইয়ের দোকানের সামনে। ফারিহা নিজে না এসে ওই মেয়েটাকে পাঠিয়েছে। মেয়েটাকে আমি চিনি। মেয়েটার নাম রেশমা। সিক্স ডিগ্রি ব্ল্যাকবেল্ট। তায়কোয়ান্দোতে। তায়কোয়ান্দো কী জানিস? কারাতের মতো, কিন্তু হাতের সাথে সাথে তারা সমানভাবে পা চালাতে পারে।"

টুনির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। ছোটাচ্চু বলল, "এখন বুঝেছিস ঠিক চারটার সময় কী হবে? বেকুব মানুষটা রেশমাকে এসে বলবে, তোমাকে দেখতে তেঁতুলের মতো লাগছে। তারপর কী হবে?" ছোটাচ্চু কেমন যেন শিউরে উঠল, তারপর কুচকুচে আলকাতরার মতো কফিটার পুরোটা এক ঢোকে খেয়ে ফেলে মুখটা বিকৃত করে বসে রইল। খানিকক্ষণ পর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মাস খানেক আগে একজন ছিনতাইকারী রেশমার ব্যাগ ধরে টান দিয়েছিল, রেশমা তাকে ধরে এমন ধোলাই দিয়েছে যে সে এখনো হাসপাতালে। কয়দিন আগে একটা ইভ টিজার রেশমাকে টিটকারি দিয়ে কী একটা বলেছিল, তারপর কী হলো জানিস?"

"কী?"

"সেই ইভ টিজারের হাতটা ধরে রেশমা এমন মোচড় দিয়েছে যে তার ডান হাতটা সকেট থেকে খুলে বের হয়ে এসেছে। আরেকদিন স্কুলে যাচ্ছিল কয়েকটা মেয়ে, লোকাল মাস্তানরা সেই মেয়েদের ইভ টিজিং করেছে, তারপর কী হয়েছে জানিস?"

"কী হয়েছে?"

"রেশমা মাস্তানদের কী করেছে কে জানে, কিন্তু সবগুলোর ঘাড় পাকাপাকিভাবে বাঁকা হয়ে গেছে। এখন সোজা সামনের দিকে মাথা আটকে থাকে, ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে পারে না।"

ছোটাচ্চু পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করে কেমন যেন শিউরে উঠে বলল, "এই মেয়ে খালি হাতে যেকোনো মানুষকে মার্ডার করে ফেলতে পারে। রেশমা সবচেয়ে বেশি ঘেন্না করে ইভ টিজারদের। এখন যখন ইশতিয়াক রেশমাকে বলবে তাকে দেখে তার তেঁতুলের কথা মনে পড়ছে, তখন অবস্থাটা কী হবে কল্পনা করতে পারিস?"

টুনি এমনভাবে মাথা নাড়ল যেটা হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে। ছোটাচ্চু অনেক লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন তুই বল, ফারিহা থেকে ডেঞ্জারাস কোনো মেয়ে বাংলাদেশে আছে? এই রকম ভয়ংকর প্ল্যান আর কেউ করতে পারবে?"

টুনি বলল, "না।"

ছোটাচ্চু হঠাৎ চমকে উঠে বলল, "ওই যে ইশতিয়াক হাসান বেকুবটা এগিয়ে যাচ্ছে রেশমার দিকে। কী সর্বনাশ! কী ভয়ংকর! হায় খোদা, তুমি রক্ষা করো।"

ছোটাচ্চু ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। ছোটদের সাহস বেশি হয়, তাই টুনি তাকিয়ে রইল। সে দেখল, ইশতিয়াক হাসান মুখে একটা ভ্যাবলা টাইপের হাসি ফুটিয়ে রেশমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রেশমার কাছে গিয়ে তার কানের একেবারে কাছে মুখ নিয়ে সে কিছু একটা বলল। তখন রেশমা ঝট করে ঘুরে ইশতিয়াক হাসানের দিকে তাকাল। দেখতে দেখতে রেশমার চেহারাটা কেমন যেন বাঘিনীর মতো হয়ে গেল। টুনি এর আগে কখনো বাঘিনী দেখেনি, কিংবা কখনো কোনো মানুষকেও চোখের সামনে বাঘিনীর মতো হয়ে যেতে দেখেনি! ব্যাপারটা যদি ঘটে তাহলে নিশ্চয়ই এভাবে ঘটবে! টুনি দেখল রেশমা দাঁতে দাঁত ঘষে কিছু একটা বলে ইশতিয়াক হাসানের দিকে এগোতে থাকে আর দেখতে দেখতে ইশতিয়াক হাসানের চেহারাটা কেমন যেন ইঁদুরের মতো হয়ে গেল। তার চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নিচের ঠোঁট নড়তে থাকে আর জিবটা বের হয়ে আসে!

রেশমা খপ করে ইশতিয়াকের বুকের কাপড় ধরে ফেলল, তারপর ডান হাতটা ওপরে তুলল এবং টুনি বুঝতে পারল পরের মুহূর্তে হাতটা নেমে আসবে আর সে দেখবে যেখানে ইশতিয়াকের মাথাটা থাকার কথা সেখানে কিছু নেই!

ছোটাচ্চু চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বলল, "হে খোদা! তুমি রক্ষা করো।" আর মনে হলো খোদা ছোটাচ্চুর কথা শুনলেন। ইশতিয়াক হাসান হঠাৎ ঝাপটা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উল্টোদিকে একটা দৌড় দিল। রেশমাও হুংকার দিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল। ইশতিয়াক ছুটতে ছুটতে একটা বুটিকের দোকানের এক দিক দিয়ে ঢুকে সমস্ত জামাকাপড় ছিটকে ফেলে অন্যদিকে বের হয়ে গেল, পেছনে পেছনে হুংকার দিতে দিতে রেশমাও গেল। বুটিকের দোকান থেকে বের হয়ে একটা খেলনার দোকান, সেখানকার সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে একটা জুতার দোকান। সবাই দেখল জুতো-স্যান্ডেল উড়ে উড়ে যাচ্ছে, তার ভেতর দিয়ে একজন সুদর্শন যুবক ছুটে যাচ্ছে, পিছু পিছু লাল শাড়ি পরা একটা মেয়ে। শাড়ি-স্যান্ডেল পরে থাকার কারণে রেশমার একটা বিশাল অসুবিধা, তাই ইশতিয়াক হাসান একটা কম্পিউটারের দোকানে ঢুকে মাউস কি-বোর্ড উড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে কোনোভাবে বের হয়ে মানুষের ভিড়ের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তার একটা জুতো পা থেকে খুলে রয়ে গেল। রেশমা সেই জুতোটা হাতে নিয়ে হিংস্রভাবে সেটার দিকেই তাকিয়ে রইল।

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি এখন তাকাতে পারো। ঘটনা শেষ।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কেউ কি মারা গেছে?"

"না।"

"গুরুতর আহত?"

"না।"

"হাত পা লিভার কিডনি এ রকম কিছু কি পড়ে আছে?"

"না। শুধু একটা জুতো।"

ছোটাচ্চু তখন ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল, শপিং মলের বিভিন্ন দোকান লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, এখানে-সেখানে বিস্মিত মানুষের জটলা। তার মাঝে রেশমা ইশতিয়াকের এক পাটি জুতো নিয়ে ফিরে আসছে। তাকে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না কিছু একটা হয়েছে।

ছোটাচ্চু ফিসফিস করে বলল, "চল পালাই।"

টুনি বলল, "চলো।"

ছোটাচ্চু গলা আরও নামিয়ে বলল, "রেশমা আমাকে দেখে ফেললে কিন্তু কিছু একটা সন্দেহ করবে। তাহলে খবর আছে। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি রেশমা আপুর একটা অটোগ্রাফ নিতে চাচ্ছিলাম।"

ছোটাচ্চু ভয় পেয়ে বলল, "আজকে না। আরেক দিন। আমি তোকে এনে দেব।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।" ছোটাচ্চু তখন টুনির হাত ধরে তাকে টেনে বের করে নিয়ে এল।

ডলি খালার কাছে ছোটাচ্চু তার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির পক্ষ থেকে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল—বিলসহ।

ডলি খালা বিল তো দিলই না, উল্টো ছোটাচ্চু আর তার ডিটেকটিভ এজেন্সির ওপর ভয়ানক খেপে গেল। পারলে কাঁচা খেয়ে ফেলে। কারণটা কী, ছোটাচ্চু এখনো বুঝতে পারেনি।

শুধু ডলি খালার মেয়ে ছোটাচ্চুর কাছে দুই শব্দের একটা এসএমএস পাঠিয়েছে। শব্দ দুটি হলো "থ্যাংক ইউ।"

ছোটাচ্চু আপাতত এই শব্দ দুইটাই তার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রথম উপার্জন হিসেবে ধরে নিয়েছে!



প্রত্যেকদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ছোটাচ্চুর প্রথম কাজ হচ্ছে তার ওয়েব সাইটে ঢুকে দেখা, কেউ তার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে তার জন্যে কোনো কেস দিয়েছে কি-না। প্রায় দিনই কিছু না কিছু থাকে কিন্তু সেগুলো দেখে ছোটাচ্চুর মেজাজ গরম হয়ে যায়! যেরকম একদিন একজন লিখেছে

"তোমার কামের অভাব হইছে? রংবাজী কর?"

ছোটাচ্চু কিছুতেই বুঝতে পারে না, সে যদি একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে তাতে অন্য মানুষের সমস্যা কী? সবচেয়ে বড় কথা প্রশ্নটা যদি সত্যিই সে করতে চায় শুদ্ধ বাংলায় করলে কী দোষ হতো?

আরেকদিন আরেকজন লিখল

"আমার হৃদয় চুরি গিয়েছে। কে আমার হৃদয় হরণ করেছে খুঁজে বের করে দিতে পারবেন?"

এটা শুদ্ধ ভাষায় লেখা ছিল কিন্তু তারপরেও ছোটাচ্চুর মেজাজ খুবই খারাপ হল। সবচেয়ে মেজাজ গরম হয় যখন কেউ তার কাজ করার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করে। যেমন একদিন একজন লিখল

"তুমি ডিটেকটিভ বানান করতে পারবা যে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছ?"

ছোটাচ্চু অবশ্যি তার এই চিঠিপত্রগুলো কাউকে দেখায় না। যখন বাসার ছেলেমেয়েরা আশে পাশে থাকে তখন বড় বড় কথাবার্তা বলে। তার প্রিয় বক্তৃতাটা সাধারণত এরকম হয় "আমরা এখন একটা ক্রান্তিকালে আছি। সবকিছু হবে ভারচুয়াল জগতে সে জন্যেই তো এই অসাধারণ ওয়েব সাইটটা তৈরি করেছি।"

তখন ত্যাঁদড় শান্ত বা অন্য কেউ একজন বলে, "এটা অসাধারণ কেমন করে হল? দুনিয়ায় সব ওয়েব সাইটই তো এরকম।"

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলে, "তুই জানিস, এই ওয়েব সাইটটা কে তৈরি করেছে?"

বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে, "কে?"

"একজন সুপার জিনিয়াস। তাকে গুগলে চাকরির অফার দিয়েছে সে নেয় নাই। ফেসবুক তার পিছনে পিছনে ঘুরে, সে পাত্তা দেয় না। মাইক্রোসফট দিনে দুইবার ফোন করে সে ফোন ধরে না।"

যারা ছোট তারা ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে না পারলেও ছোটাচ্চুর গম্ভীর মুখ দেখে তারা মুগ্ধ হয়ে যাবার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ে। শুধু শান্ত বলে, "এতো বড় জিনিয়াস হলে সে বসে বসে ওয়েব সাইট কেন তৈরি করে? আমাদের ক্লাসের ফাক্কুও তো ওয়েব সাইট বানায়।"

ফাক্কু নামের স্কুলের একজন ছাত্রের সাথে এতো বড় জিনিয়াসের তুলনা করার জন্যে ছোটাচ্চু খুব রেগে গেল, ধমক দিয়ে বলল, "যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলবি না।"

তখন একজন একটু ভয়ে ভয়ে বলল, "ছোটাচ্চু কিন্তু তোমার ওয়েব সাইটের রংটা ভালো হয় নাই। দেখলে মনে হয় ইনফেকশান হয়ে গেছে।"

ছোটাচ্চু তখন আরো জোরে ধমক দিয়ে বলে, "ইনফেকশান? ওয়েবসাইটের আবার ইনফেকশান হয় কেমন করে?"

"কেমন যেন ঘা হয়ে গেছে মনে হয়।"

ছোটাচ্চু হুংকার দিয়ে বলে, "আমার সাথে ইয়ারকী করিস, ওয়েব সাইটের ঘা হয়েছে মনে হয়?"

আলাপ আরো এগিয়ে যেতো কিন্তু টুনি পুরো ব্যাপারটাতে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়, আস্তে আস্তে বলে, "ওয়েব সাইট ভালো না খারাপ তাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে কেস আসছে কি-না।"

তখন সবাই ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ছোটাচ্চু, কেস কি আসছে?"

ছোটাচ্চু তখন একটু আমতা আমতা করে বলে, "মানে এখনো সেভাবে আসতে শুরু করেনি। লোকজন খোঁজ খবর নিচ্ছে। ভালো করে একবার প্রচার করতে পারলে তখন দেখবি কেস নিয়ে কুল পাব না।"

একজন বলল, "তুমি যদি কেস সলভ করো তাহলে প্রচার হবে।"

আরেকজন বলল, "প্রচার হলে তোমার কাছে কেস আসবে।"

জ্ঞানী টাইপের একজন বুঝিয়ে দিল, "কেস হচ্ছে মুরগি আর প্রচার হচ্ছে ডিম। মুরগি আগে না ডিম আগে?"

যারা হাজির ছিল তাদের অর্ধেক চিৎকার করতে লাগল, "ডিম! ডিম!" অন্য অর্ধেক চিৎকার করতে লাগল, "মুরগি! মুরগি।" ছোটাচ্চু তখন দুই দলকেই ধমক দিয়ে তার ঘর থেকে বের করে দিল।

প্রত্যেকদিন মোটামুটি একই রকম ঘটনা, তার মাঝে একদিন একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটে গেল, ছোটাচ্চু ঘুম থেকে উঠে তার ওয়েব সাইটে ঢুকে দেখল, একজন সেখানে তার জন্যে একটা লম্বা চিঠি লিখে লিখেছে, যে ফর্মটা রাখা আছে তার সবকিছু ঠিক ঠিক ভাবে পূরণ করেছে। যেখানে ঠিকানা লেখার কথা সেখানে ঠিকানা লিখেছে, যেখানে টেলিফোন নম্বর লেখার কথা সেখানে টেলিফোন নম্বর লিখেছে, যেখানে সমস্যার বর্ণনা দেয়ার কথা সেখানে সমস্যার বর্ণনা দিয়েছে। ছোটাচ্চু একবার পড়ল তারপর দুইবার পড়ল তারপর তিনবার পড়ল তারপর আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "ইয়া হু উ উ উ...!"

বাসার বাচ্চা কাচ্চারা যে যেখানে ছিল সেখান থেকে ছুটে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু তার বুকে থাবা দিয়ে বলল, "তোরা ভেবেছিলি আমার ওয়েব সাইটে কোনোদিন কেস আসবে না। এই দেখ কেস এসে গেছে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাঁটি কেস।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কী কেস ছোটাচ্চু? মার্ডার? সিংগেল না ডাবল?"

ছোটাচ্চু বলল, "না মার্ডার না। কিন্তু মার্ডার থেকেও জটিল।"

সবাই জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, "কী কেস? কী কেস?"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিক আছে, শোন তাহলে, আমি পড়ে শোনাই।"

ছোটাচ্চু তখন তার ইনফেকশান ওয়ালা ওয়েব সাইট থেকে চিঠিটা পড়ে শোনাতে আরম্ভ করল

> "মহোদয়
>
> আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা, যথেষ্ট উচ্চ পদে আছি। আমি একটা বিশেষ বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমাদের দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি আছে আমার জানা ছিল না, জেনে খুব খুশি হয়েছি।
>
> প্রথমে আমার পরিবার সম্পর্কে বলি। আমি, আমার স্ত্রী এবং আমার দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার সংসার।

আমার স্ত্রী একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করেন। আমার মেয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, আমার ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। আমার সমস্যাটি আমার ছেলেকে নিয়ে।

আমার ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই মেধাবী ছাত্রছাত্রী। আমার ছেলে একাধিকবার বিভিন্ন গণিত অলিম্পিয়াডে মেডেল পেয়েছে। গণিত এবং বিজ্ঞান তার খুবই প্রিয় বিষয়। আমি আপনাদের এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করছি আমার ছেলের সমস্যা নিয়ে।

আমি সবসময়েই স্বপ্ন দেখেছি আমার ছেলে একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে। একটি ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যে সে প্রস্তুতি নিবে। কিন্তু কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না, সে একজন বিজ্ঞানী হতে চায়। যখন ছোট ছিল আমি ভেবেছি এটা তার একটা ছেলেমানুষী স্বপ্ন। কিন্তু যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ঘোষণা দিল সে ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবে না, সে বিজ্ঞানী হতে চায় তাই কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হবে। তখন তার সাথে আমার এক ধরনের গোলমাল শুরু হয়। প্রথমে আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, সে বুঝতে রাজি না হওয়ায় আমি বাধ্য হয়ে তাকে শাসন করা শুরু করি। কথাবার্তার এক পর্যায়ে আমি তাকে বলি যেহেতু সে আমার উপার্জনে আমার বাসায় আছে তাই তাকে আমার কথা শুনতে হবে। সে যদি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তাহলে তাকে আমার বাসা থেকে বের হয়ে নিজের খরচ নিজেকে উপার্জন করতে হবে।

আমি রাগের মাথায় কথাটি বলেছিলাম কিন্তু আমার ছেলে সেটি আক্ষরিকভাবে নিয়েছে এবং দুই সপ্তাহ আগে বাসা থেকে বের হয়ে গেছে। তার নিজের ল্যাপটপ ছাড়া সে আর কিছুই সাথে নেয় নাই।

বাস্তব জীবনে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ আমার ছেলে দুই একদিনের মাঝেই চলে আসবে বলে আমার ধারণা ছিল কিন্তু আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হল সে ফিরে আসেনি এবং সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল জায়গায় তাকে খুঁজে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমি এখন আমার ছেলের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তিত। আমার স্ত্রী খুব ভেঙে পড়েছেন এবং পারিবারিক ভাবে আমি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। আমার মেয়েটিও আমার সাথে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।

এরকম অবস্থায় ইন্টারনেটে আপনার প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পেয়ে যোগাযোগ করছি। অনুগ্রহ করে আমার ছেলেকে খুঁজে বের করে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। এ জন্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো ফী দিতে আমি প্রস্তুত—"

ছোটাচ্চু এতোটুকু পড়ে আনন্দে আবার চিৎকার করে উঠল, কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা বাচ্চা কাচ্চারা সেই আনন্দে অংশ নিল না, সবাই শীতল চোখে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চাদের মাঝে যে একটু বড় সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "ছোটাচ্চু। এরকম একটা চিঠি পড়ে তোমার আনন্দ হচ্ছে? তুমি কি গোলাম আযমের ভাতিজা?"

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তখন আরেকজন বলল, "আমরা তোমার সাথে আর কোনোদিন খেলব না। তুমি হচ্ছ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর।"

আরেকজন বলল, "তোমার বুকে নিশ্চয়ই লোম নাই।"

বুকে লোম না থাকা কিংবা গোলাম আযমের ভাতিজা হওয়া এই ব্যাপারগুলোর মাঝে সম্পর্কটা ছোটাচ্চু পুরোপুরি ধরতে না পারলেও বিজ্ঞানী হতে চাওয়া ছেলেটার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার ঘটনাটা শুনে তার আনন্দ প্রকাশ করাটা যে ঠিক হয় নাই সেটা বুঝতে পারল। ব্যাপারটা সামলানোর জন্যে বলল, "আহা! আমি কি ছেলেটার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্যে আনন্দ করছি? আমি আনন্দ করছি কারণ এখন আমি ছেলেটাকে খুঁজে বের করে বাসায় নিয়ে আসব, তখন সবাই কতো আনন্দ করবে সেই কথা চিন্তা করে।"

ছোট একজন বলল, "কচু।"

তার থেকে একটু বড় একজন বলল, "আলু ভর্তা।"

তার থেকে আরেকটু বড় একজন বলল, "শুটকি ভাজি।"

বড় একজন বলল, "আমরা তোমাকে ত্যাজ্য চাচ্চু করলাম। তোমার সাথে এখন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" তারপর সেটা প্রমাণ করার জন্যে সবাই লাইন ধরে বের হয়ে গেল। টুনি ছাড়া।

সবাই বের হয়ে গেলে টুনি ছোটাচ্চুর চেয়ারটায় বসে তার চশমাটা একটু ঠিক করে বলল, "কাজটা ঠিক হয় নাই, কিন্তু আমি তোমাকে এইবারের মতো মাফ করে দিলাম।"

ছোটাচ্চু ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "মাফ করে দিলি? তুই? আমাকে?"

"হ্যাঁ। কেন বুঝতে পারছ তো?"

"কেন?"

"তোমার এখন সাহায্য দরকার। তা না হলে তুমি এই কেস সলভ করতে পারবে না।"

"আমি পারব না?"

"এইটা তোমার একটা সুযোগ। তাই ছোটাচ্চু, তোমার যদি কোনো সাহায্য লাগে তাহলে আমাকে বল। লজ্জা করো না।"

ছোটাচ্চু টুনির কথাগুলো হজম করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম টুনি। আমার যখন সাহায্য লাগবে আমি আপনার কাছে আসব, লজ্জা করব না।"

টুনি বলল, "থ্যাংকু।" তারপর সেও বের হয়ে গেল।

ঘণ্টা খানেক পর দেখা গেল ছোটাচ্চু ফারিহার সাথে কথা বলছে, গলার স্বর খুবই নরম আর কাঁচুমাচু। কথা শুরু হল এভাবে

"ফারিহা, তোমাকে একটা বিশেষ দরকারে ফোন করছি।"

"বল। টাকা ধার দিতে হবে?"

ছোটাচ্চু বলল, "না না। টাকা ধার দিতে হবে না। অন্য একটা দরকার।"

"বল, কী দরকার।"

ছোটাচ্চু কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, "আমি আমার প্রথম কেসটা পেয়েছি। আমার ওয়েব সাইটে একজন কেস ফাইল করেছে।"

"কংগ্রাচুলেশান।"

"এই ব্যাপারে তোমার হেল্প লাগবে।"

ফারিহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "তোমায় কেস সলভ করে দিতে হবে?"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। কেস আমি নিজেই সলভ করব—কিন্তু পার্টির কাছে যাবার ব্যাপারে হেল্প লাগবে।"

"গাড়ি দিতে হবে?"

ছোটাচ্চু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "বুঝতেই পারছ, ক্লায়েন্টের কাছে যদি একটা রিকশা না হয় একটা সি.এন.জি দিয়ে যাই, ক্লায়েন্ট গুরুত্ব দেবে না। অনেক বাসা আছে গাড়ি ছাড়া ঢোকাই যাবে না।"

"ঠিক আছে। কখন লাগবে বল—আব্বুকে বলে ম্যানেজ করে দিতে হবে। আর কিছু?"

"গাড়ি হচ্ছে একটা। বলতে পার সোজা বিষয়টা। তোমার আরেকটু সাহায্য লাগবে।"

ফারিহা বলল, "বল, কী সাহায্য?"

"বুঝতেই পারছ আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে আমি একা।"

"তোমাদের টুনি আছে। খুবই স্মার্ট মেয়ে।"

ছোটাচ্চু এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল, টুনি তার কথা শুনে ফেলল কি-না, তারপর বলল, "কিন্তু টুনি তো বাচ্চা মেয়ে, তাকে তো আমার কাজে লাগাতে পারি না। তুমি যদি একটু সাহায্য কর।"

"ঝেড়ে কাশো। পরিষ্কার করে বল।"

ছোটাচ্চু এবারে ঝেড়ে কাশল অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলল, "আমার ক্লায়েন্টের সাথে তুমি যদি একটু কথা বল। ভান করো তুমি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সেক্রেটারি। টিশ টাশ করে একটু ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলবে। একটু এপয়েন্টমেন্ট করবে। প্রফেশনাল একটা ভাব দেখাবে--"

"আমাকে কী দেবে?"

"তুমি কী চাও?"

ফারিহা এবারে হেসে ফেলল, "তোমার দেবার মতো কী আছে?"

"আউল ফাউল কয়টা সিম আছে। লাগলে দিতে পারি।"

"থাক। আমার নিজের টেলিফোনের যন্ত্রণাতেই বাঁচি না। এখন যদি আউল ফাউল সিমের যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলেই গেছি।"

"তাহলে কী চাও?"

"প্রথম বিল পেয়ে আমাকে দোসা খাইয়ে দিও। খুব ভালো একটা দোসার দোকান হয়েছে। ভয় পেয়ো না, বেশি বিল উঠবে না!"

ছোটাচ্চু বলল, "আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না।"

সেদিন বিকেলেই ফারিহা ছোটাচ্চুর কাছে চলে এল। ছোটাচ্চু তাকে টেলিফোন নম্বর দিয়ে কী বলতে হবে বুঝিয়ে দিল। ফারিহা নাম্বারটা ডায়াল করে টেলিফোন কানে লাগায়, দুটো রিং হওয়ার পরই কেউ একজন ফোনটা ধরে বলল, "হ্যালো।"

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার হোসেন? আকবর হোসেন?"

"কথা বলছি।"

"হায়! আমি আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে বলছি। আমাদের ডাটাবেসে আপনার একটা এনট্রি হয়েছে। আই এম সরি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে দেরি হল। আমরা সাধারণত আরো তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করি, আনফরচুনেটলি লাস্ট ফিউ ডেজ হঠাৎ করে কাজের চাপ বেড়ে গেছে।"

ওই পাশ থেকে আকবর হোসেন বললেন, "ইট ইজ অলরাইট।"

ফারিহা বলল, "আপনার কেসটা প্রসেস করার জন্যে আমাদের একজন রিপ্রেজেনটিটিভের আপনার সাথে কথা বলা দরকার। কখন আপনি সময় দিতে পারবেন?"

"এখনই চলে আসতে পারেন। আমরা আসলে খুবই অস্থির হয়ে আছি।"

ফারিহা বলল, "আমি একটু দেখি আমাদের কেউ ফ্রি আছে কি না।" তারপর ছোটাচ্চুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল একটু খুট খাট শব্দ করল, তারপর বলল, "আই এম সরি মি. হোসেন। আজকে কেউ ফ্রি নেই। কাল বিকেলের আগে আসলে কেউ যেতে পারবে না।"

ওই পাশের আকবর হোসেন একটু হতাশ হলেন। বললেন, "ঠিক আছে তাহলে কাল বিকেলেই।"

ফারিহা খুট-খাট শব্দ করে বলল, "আমাদের সিস্টেমে যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটা আপ টু ডেট তো?"

"জি। এটা আপ টু ডেট।"

"ভেরি গুড। কাল বিকেলে একজন যাবে।"

"কে আসবে? কী নাম?"

"এক সেকেন্ড, আমি দেখি কাল কে ফ্রি আছে।" ফারিহা খুট-খাট একটু শব্দ করে বলল, "আপনার কাছে যাবে মিস্টার শাহরিয়ার। এ ভেরি ইয়াং এনার্জেটিক চ্যাপ। অলরেডি সে দুটো কেস সলভ করেছে।" আকবর হোসেন অন্য পাশ থেকে বললেন, "থ্যাংক ইউ। কাল বিকেলে আমি মিস্টার শাহরিয়ারের জন্যে অপেক্ষা করব।"

ফোনটা রেখে দেবার পর ছোটাচ্চু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক। ফারিহা, তুমি না থাকলে যে আমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কী হত!"

ফারিহা বলল, "কথাটা মনে রেখো।"

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছোটাচ্চু যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে তার হলুদ বইটায় হারানো মানুষ কেমন করে খুঁজে বের করতে হয় সেটা পড়ছে, তখন টুনি এসে হাজির হল। ছোটাচ্চু বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, "কী খবর টুনি?"

"তুমি হারিয়ে যাওয়া ছেলেটার বাবার কাছে কখন যাবে?"

"কালকে বিকেলে।"

"আমাকে নিয়ে যাবে?"

"তোর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। তুই ভাবছিস এটা টুম্পার টিফিন চুরির কেস?"

টুনি কথাটা না শোনার ভান করে বলল, "তুমি ইন্টারভিউয়ে কী জিজ্ঞেস করবে?"

"সেটা তোর জানার দরকার নাই।"

"ছেলেটার ফটো, ই-মেইল এড্রেস, ফেস বুক একাউন্ট এই সব নিয়ে এসো।"

"তোকে সেটা বলে দিতে হবে না। আমি জানি।"

"বন্ধু বান্ধবের নাম। ফোন নম্বর।"

"আমি জানি।"

"যদি ওর ডাইরি থাকে। চিঠিপত্র সেগুলো।"

ছোটাচ্চু মেঘ স্বরে বলল, "আমি জানি।"

"তুমি কেমন করে জান?"

ছোটাচ্চু হাতের বইটা দেখিয়ে বলল, "এই বইয়ে সব লেখা আছে।"

টুনি বলল, "বইটা আমাকে পড়তে দিবে।"

"ইংরেজি বই। পড়তে পারবি?"

"আস্তে আস্তে পড়ব। ডিকশনারি দেখে দেখে।"

ছোটাচ্চু একটু নরম হল, বলল, "ঠিক আছে।"

টুনি যখন চলে যাচ্ছে ছোটাচ্চু তখন বলল, "টুনি, শোন।"

"কী?"

"আমার চেহারার মাঝে কি একটা ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ ভাব আছে?"

"না। তোমাকে দেখে স্কুলের বাচ্চার মতো লাগে।"

"তাহলে?"

"মোচ রেখে দাও। মোচ থাকলে বয়স্ক লাগে।"

ছোটাচ্চু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কাল বিকালের মাঝে মোচ উঠবে না। তাছাড়া—"

"তাছাড়া কী?"

ফারিহা যে গোঁফ দুই চোখে দেখতে পারে না ছোটাচ্চু সেটা আর বলতে পারল না। কথাটা এড়িয়ে বলল, "তাহলে কি একটা টাই পরে যাব?"

"হ্যাঁ। টাই পরলে বয়স্ক লাগবে। আর চশমা।"

"আমার চোখ খারাপ না, চশমা কীভাবে পরব?"

"জিরো পাওয়ারের চশমা পাওয়া যায়।"

পরদিন বিকালে ছোটাচ্চু ফারিহার ব্যবস্থা করা গাড়িতে জিরো পাওয়ারের চশমা আর টাই পরে আকবর হোসেনের বাসায় হাজির হল। ছোটাচ্চুর বুক ধুক ধুক করছে কিন্তু মুখের মাঝে একটা গাম্ভীর্য ধরে রেখে সে দরজার বেলে চাপ দিল। যে মানুষটি দরজা খুলে দিল ছোটাচ্চু অনুমান করল সে নিশ্চয়ই আকবর হোসেন। চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর বয়স চেহারার মাঝে একটা সরকারি অফিসারের মতো ভাব। মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "শাহরিয়ার সাহেব?"

ছোটাচ্চু তার চশমাটা ঠিক করে বলল, "জি। আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে এসেছি। আমাকে একটা এসাইনমেন্টের জন্যে পাঠানো হয়েছে।"

"আমি আকবর হোসেন, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আসেন। ভিতরে আসনে।"

ছোটাচ্চু ভিতরে ঢুকল। ভিতরে একটা সোফা, সেই সোফায় একজন মহিলা বসে আছে। ছোটাচ্চুর ঘরে ঢোকার পর মহিলা ঘুরে তাকাল এবং তাকে দেখে ছোটাচ্চুর রক্ত হিম হয়ে গেল। মহিলাটি ডলি খালা—সেই ফর্সা নাদুস নুদুস চেহারা, সেই সিল্কের শাড়ি, সেই লিপস্টিক। চেহারাটা শুধু অন্যরকম, এখন একটা হিংস্র বাঘিনীর মতো। ছোটাচ্চুকে দেখেই ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দুলাভাই! আমি যেটা সন্দেহ করেছিলাম তাই। এই সেই ছেলে। এর থেকে সাবধান।"

ছোটাচ্চু কী করবে বুঝতে পারল না, একবার মনে হল একটা দৌড় দেয়, কিন্তু তার জন্যে দেরি হয়ে গেছে। ডলি খালা বলল, "আমাদের জোবেদাবুর ছেলে। জোবেদাবু হচ্ছে ফিরেশতার মতো মানুষ। তাঁর সব ছেলে মেয়ে মানুষ হয়েছে, এইটা ছাড়া (ডলি খালা এই সময় আঙুল দিয়ে ছোটাচ্চুকে দেখাল)। সব ছেলে মেয়ে বড় বড় চাকরি বাকরি করে আর ছোট ছেলের যা হয় তাই হয়েছে। টেনে টুনে পরীক্ষায় কোনোমতে পাস করেছে, কোনো চাকরি বাকরি পায় না তখন এই ডিটেকটিভগিরি শুরু করেছে। আমি যখন প্রথম শুনেছি তখন ভাবলাম ভালোই তো, সব দেশে থাকে আমাদের দেশে থাকবে না কেন? ও মা, খোঁজ নিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেছে। বুঝলে দুলাভাই (ডলি খালা এই সময়ে আকবর হোসেনের দিকে তাকাল) এর ডিটেকটিভ এজেন্সি কী জান? এই ছেলে পকেটে একটা মোবাইল ফোন আর কয়েকটা বেআইনি সিম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কিছু নাই, কয়টা মেয়ে বন্ধু আছে তাদের দিয়ে মাঝে মধ্যে ফোন করায়। আমি সোজা সরল মানুষ (ডলি খালা এই সময় নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল) আমার মেয়ের জন্যে জামাই খুঁজছি, এই ছেলেকে বিশ্বাস করে একটু খোঁজ খবর নিতে দিয়েছি। তখন তো বুঝি নাই তার কিছু নাই, ভেবেছিলাম আসলেই বুঝি অফিস আছে, লোকজন আছে, সরকারের পারমিশান আছে। সে আমার সর্বনাশ করে ছেড়ে দিয়েছে। সোনার টুকরা একটা ছেলে, আমেরিকা থেকে দেশে বিয়ে করতে এসেছে, তাকে এমন ভয় দেখালো।

সেই ছেলে—(এই সময় ডলি খালার গলা ধরে এলো, ডলি খালা হেঁচকি তোলার মতো একটা শব্দ করল তারপর তার হতে পারতো জামাইয়ের সব ঘটনা স্মরণ করে কেমন যেন শিউরে উঠল ।)"

ছোটাচ্চু পুরোপুরি ভ্যাবাচেকা খেয়ে ডলি খালার দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে যে ডলি খালা থাকবে আর তার এতো বড় সর্বনাশ করবে সেটা ছোটাচ্চু একবারও ভাবেনি। একজন মানুষ যে টানা এতোক্ষণ একভাবে কারো বিরুদ্ধে এতো খারাপ খারাপ কথা বলতে পারে, ছোটাচ্চু নিজের চোখে না দেখলে সেটা বিশ্বাস করতো না। ছোটাচ্চু একবার ভাবল প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলে, কিন্তু সে বুঝতে পারল বলে কোনো লাভ নেই, সে কখনোই এরকম তীব্র ভাষার বক্তব্যের ধারে কাছে যেতে পারবে না। দেশে কোটি কোটি মানুষ—তাদের ভিতরে একজন তাকে একটা কেস দিতে চাইছে কী কপাল, সেই মানুষটা কি না ডলি খালার পরিচিত। এর থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে! ডলি খালার আক্রমণকে ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। ছোটাচ্চু হাল ছেড়ে দিয়ে ডলি খালার দিকে তাকিয়ে, পরের আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

ডলি খালা ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিল, তারপর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "বুঝলে দুলাভাই, যখন খবর পেয়েছি সুমন হারিয়ে গেছে তখন আমার বুকটা ভেঙে গেছে।" ছোটাচ্চু বুঝতে পারল সুমন নিশ্চয়ই আকবর হোসেনের পালিয়ে যাওয়া ছেলের নাম। আমরা সব জায়গায় সুমনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তখন খবর পেলাম তুমি নাকি ইন্টারনেট থেকে ডিটেকটিভ এজেন্সি বের করে তাদেরকে লাগাচ্ছ, তখন আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছি তোমাকে সাবধান করার জন্যে। এই ছেলে আমার সর্বনাশ করেছে তোমার যেন সর্বনাশ করতে না পারে। (এই সময় ডলি খালার গলা আবার ধরে এল, চোখ থেকে মনে হল দুই ফোঁটা পানিও বের হল।)" ডলি খালা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি গেলাম দুলাভাই, তুমি পরে আমাকে বলো না যে আমি তোমাকে সাবধান করি নাই। এই ছেলে আজকে গলায় টাই আর চোখে চশমা লাগিয়ে এসেছে, আসলে ভুসভুসে ময়লা টি শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, চোখে নিশ্চয়ই জিরো পাওয়ারের চশমা। যে গাড়ি তাকে নামিয়ে দিয়েছে খোঁজ নিয়ে দেখো নিশ্চয়ই ভাড়া গাড়ি, না হলে কারো কাছ থেকে ম্যানেজ করেছে।"

ছোটাচ্চু এখন এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে ডলি খালার দিকে তাকিয়ে রইল। যখন বুঝে গেছে এখানে তার সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে তখন

এই পুরো ব্যাপারটাকে একটা নাটক হিসেবে দেখে উপভোগ করা যেতেই পারে।

ডলি খালা ব্যাগ থেকে টিস্যু বের করে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছোটাচ্চু লক্ষ করল চোখ মুছল খুব কায়দা করে যেন চোখের রং ল্যাপ্টে না যায়। একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল ডলি খালা চলে গেছে।

আকবর হোসেন চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন, তারপর এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে বসলেন। ছোটাচ্চুও তাই করল, তখন হঠাৎ মনে হল গলায় টাইটা ফাঁসের মতো আটকে আছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তাই তখন টাইয়ের নটটা প্রথমে একটু ঢিলে করল তারপর খুলেই ফেলল। আকবর হোসেন তখন এক পায়ের উপর তুলে রাখা অন্য পাটা সরিয়ে বসল, ছোটাচ্চুও তার পা'টা সরিয়ে নিল। ছোটাচ্চুর তখন মনে হল সবকিছু মনে হয় ঝাপসা দেখা যাচ্ছে তখন জিরো পাওয়ারের চশমাটাও খুলে ফেলল। তার চশমা চোখে দেওয়ার অভ্যাস নেই তাই চশমাটা খুলতেই কানের উপর আর নাকের উপর থেকে চাপটা কমে গেল বলে মনে হল।

আকবর হোসেন একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, বললেন, "ডলি যা যা বলেছে সব সত্যি?"

ছোটাচ্চু কী বলবে একটু চিন্তা করল, তারপর বলল, "অনেক কিছু সত্যি কিন্তু যেভাবে বলেছেন সেভাবে সত্যি না।"

"যদি সত্যি হয় তাহলে আমি তোমাকে দায়িত্বটা দিতে চাই।"

ছোটাচ্চুর মনে হল সে কথাটা ঠিক করে শুনেনি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"বলেছি যে ডলির কথা সত্যি হলে আমি তোমাকে দায়িত্বটা দিতে চাই। তুমি করে বলছি দেখে কিছু মনে করোনি তো। তোমার টাই আর চশমা খোলার পর তোমাকে একটা বাচ্চা মানুষের মতোই লাগছে।"

ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না, না, কিছু মনে করি নাই। তুমি করেই তো বলবেন।" আসলে ছোটাচ্চুকে অপরিচিত কোনো মানুষ তুমি করে বললে সে খুব বিরক্ত হয়, এখন অবশ্যি অন্য ব্যাপার।

আকবর হোসেন আবার তার একটা পায়ের উপর আরেকটা পা তুলে বললেন, "ডলির কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমার এই ডিটেকটিভ এজেন্সি এখন একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ। আমি আসলে ঠিক এরকমই

চাচ্ছিলাম, যে একটু সময় দেবে। আমার মনে হয় একটু সময় দিয়ে ঠিকভাবে খোঁজাখুঁজি করলেই সুমনকে বের করে ফেলা যাবে।"

হঠাৎ করে ছোটাচ্চুর ভেতরে হুড় হুড় করে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করল। হাতে কিল দিয়ে বলল, "অবশ্যই বের করে ফেলব।"

আকবর হোসেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "পাগল ছেলেটা কেমন যে আছে! আমার মতন হয়েছে, ছেলেটার মাথায় কিছু একটা ঢুকে গেলে আর বের করা যায় না।"

"আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা—মানে আমি বের করে ফেলব।"

"থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার। তুমি কেমন করে অগ্রসর হতে চাও?"

"প্রথম ঘটনাটা আরেকটু বিস্তারিত বলেন, তারপর তার ঘরটা একটু দেখতে চাই। তার খাতাপত্র ডাইরি যদি থাকে সেগুলো একটা দেখতে চাই। তার বন্ধু বান্ধব যাদের আপনারা চিনেন, তাদের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর যদি থাকে সেগুলো নিতে চাই। আপনাদের আত্মীয় স্বজন যাদের কাছে সে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে তাদের নাম ঠিকানা চাই। মোটামুটি এগুলো হলেই কাজ শুরু করে দিতে পারব।"

"গুড!" আকবর হোসেন সোফায় হেলান দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে, আমি তাহলে শুরু করি।" আকবর হোসেন তখন সবকিছু বলতে শুরু করলেন। ছোটাচ্চু খুবই গম্ভীর ভাবে তার নোট বইয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথাবার্তা টুকে নিতে লাগল।

ছোটাচ্চু যখন বাসায় ফিরে এল তখন বাসার সব বাচ্চারা তাকে ঘিরে ধরল, জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কী হয়েছে ছোটাচ্চু? কী হয়েছে বল।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "তোরা না আমাকে ত্যাজ্য চাচ্চু করে দিয়েছিস—এখন আবার আমার সাথে কথা বলতে এসেছিস, তোদের লজ্জা করে না?"

একজন বলল, "আমরা তোমাকে মাফ করে দিয়ে আবার চাচ্চু হিসেবে নিয়ে নিয়েছি।"

"তোরা নিলেই তো হবে না আমাকেও তো নিতে হবে। আমি এখনো নেই নাই।" ছোটাচ্চু তার মুখটা শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাচ্চারা তখন ছোট ছোট লাফ দিতে দিতে বলতে লাগল, "প্লিজ ছোটাচ্চু! প্লিজ।"



"আগে বল আর কোনোদিন আমাকে গোলাম আযমের ভাতিজা বলে গালি দিবি?"

"দিব না।"

"কানে ধর।"

সবাই কানে ধরে ফেলল, ছোটাচ্চুর কাছ থেকে এই ধরনের শাস্তি তাদের জন্যে কোনো বিষয়ই না। শুধু একজন মিনমিন করে বলল, "আমরা এইগুলো করি তোমাকে লাইনে রাখার জন্যে। এইভাবে তোমাকে শাসন না করলে তুমি বেলাইনে চলে যাও তো—সেইজন্যে।"

ছোটাচ্চু হুংকার দিল, "আমি বেলাইনে যাই?"

সবাই হিহি করে হাসতে লাগল বলে ছোটাচ্চু আর বেশিক্ষণ রেগে থাকার ভান করতে পারল না।

ছোটাচ্চু তখন আকবর হোসেনের বাসায় কী হয়েছে সেটা বাচ্চাদের বলল। যেটুকু বলল তার থেকে বেশি অভিনয় করে দেখালো। ডলি খালার নাকি কান্নার অভিনয়টা এতো ভালো হল যে, বাচ্চাদের অনুরোধে সেটা কয়েকবার করে দেখাতে হল।

সব বাচ্চারা চলে যাবার পর টুনি বলল, "ছোটাচ্চু।"

"বল।"

"তুমি কি ছেলেটার বাসায় দরকারি কিছু পেয়েছ?"

"কিছু খাতাপত্র পেয়েছি।"

"ডাইরি কি আছে?"

"একটা ডাইরি আছে কিন্তু সেটা কোনো কাজে লাগবে না।"

"কেন?"

"ডাইরির মাঝে নিজের কোনো কথা নাই, শুধু বিজ্ঞানের কথা।"

"বিজ্ঞানের কথা?"

ছোটাচ্চু বলল, "হ্যাঁ। পড়ে আমি কিছু বুঝিও না।"

টুনি বলল, "তোমার বোঝার কথা না। বিজ্ঞানের কিছু দেখলে তোমার জ্বর উঠে যায়।"

ছোটাচ্চু বলল, "শুধু জ্বর না, কেমন যেন এলার্জির মতো হয়। চামড়ার মাঝে লাল র‍্যাশ বের হয়। মাথা ঘোরায়।"

টুনি বলল, "ঐ ছেলেটার খাতাটা আমাকে একটু দেখাবে?"

"তুই দেখে কী করবি? তুই কি কিছু বুঝবি?"

"তোমার থেকে বেশি বুঝব।"

ছোটাচ্চু খাতাটা বের করে টুনিকে দিল, টুনি তখন পালিয়ে যাওয়া ছেলেটার ডাইরিটা খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ল। ভিতরে নানারকম বিজ্ঞানের প্রশ্ন, যেমন এক জায়গায় লেখা, "প্রোটন আর ইলেকট্রন একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে, তাহলে ইলেকট্রন কেন প্রোটনের ভিতরে পড়ে যায় না, কেন চার্জ বিহীন কিছু একটা তৈরি হয় না? কেন হাইড্রোজেন পরমাণু হয়ে থাকে? কেন?"

আরেক জায়গায় লেখা, "গতিশীল বস্তুর কাছে দৈর্ঘ্যকে সংকুচিত মনে হয়। তাহলে কি আলোর কাছে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংকুচিত হয়ে একটা দ্বিমাত্রিক সমতল ভূমি হয়ে যায়?"

আরেক জায়গায় লেখা, "পৃথিবী থেকে কয়টা ইলেকট্রন চাঁদে নিয়ে গেলে চাঁদ প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীতে আছড়ে পড়বে?"

খাতার অনেক পাতায় নানা রকম গণিত, গণিতের শেষে মাঝে মাঝে প্রশ্নবোধক চিহ্ন। মাঝে মাঝে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। মাঝে মাঝে গোল বৃত্ত এঁকে তার মাঝে হাসি মুখের ছবি। টুনি কিছুই বুঝল না শুধু টের পেল এই ছেলেটা ছোটখাটো একটা বৈজ্ঞানিক এবং তার মনের মাঝে নানা ধরনের প্রশ্ন অনেক প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেয়েছে, অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি।

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কিছু বুঝলি?"

"উঁহু। মনে হচ্ছে এখানে অনেক রকম বিজ্ঞানের প্রশ্ন।"

"বিজ্ঞানের প্রশ্ন নিয়ে আমার কী লাভ? আমার দরকার তার ঠিকানা। তার নিজের সম্পর্কে তথ্য।"

টুনি কিছু বলল না, ভুরু কুঁচকে খাতাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটাচ্চু পরদিন সকাল থেকেই কাজে লেগে গেল। আকবর হোসেনের কাছ থেকে তার পালিয়ে যাওয়া ছেলে সুমনের বেশ কয়েকজন বন্ধুর নাম ঠিকানা ফোন নম্বর নিয়েছিল, ছোটাচ্চু একজন একজন করে তাদের সবাইকে খুঁজে বের করল, তাদের সাথে কথা বলল কিন্তু লাভ হল না। তারা কেউ সুমনের খোঁজ দিতে পারল না। একজন বলল, "দুই সপ্তাহ আগে যখন দেখা হয়েছে তখন কথাবার্তা বলছিল না। চুপ করে বসে থাকত। মনে হয় কিছু একটা চিন্তা করত। পালিয়ে যাবে আমাদের কাউকে বলেনি।"

আরেকজন বলল, "আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, ভাত কেমন করে রান্না করতে হয় আমি জানি কি না! আমি বললাম তোর আম্মুকে কেন জিজ্ঞেস করিস না। সুমন বলল, উঁহু, আম্মুকে জিজ্ঞেস করা যাবে না!"

আরেকজন বলল, "সুমন কোথায় আমি জানি না। কিন্তু আমি যদি জানতামও আমি আপনাকে বলতাম না। সুমনের ফিজিক্স পড়ার এতো সখ অথচ তার আব্বু তাকে জোর করে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে! তার আব্বুর একটা শিক্ষা হওয়া দরকার।"

কাজেই ছোটাচ্চুর সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যাবেলা মোটামুটি বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এলো। রাত্রি বেলা ছোটাচ্চু তার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করছিল, এরকম সময় টুনি এসে হাজির হল, ছোটাচ্চু টুনির পায়ের শব্দ শুনে টুনির দিকে ঘুরে তাকাল। টুনি জিজ্ঞেস করল, "সুমনের কোনো খোঁজ পেলে?"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "এখনো পাই নাই। তার বন্ধুরা হয় কিছু জানে না, না হলে আমাকে কিছু বলছে না।"

টুনি কিছু না বলে চুপ করে বসে রইল। ছোটাচ্চু আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝলি টুনি, কোনো কেস সলভ করার আগে একটা ক্লু দরকার হয়। সেই ক্লু দিয়ে শুরু করলে সেখান থেকে অন্য ক্লু বের হয়ে আসে। সেখান থেকে অন্য ক্লু। তখন ক্লুতে ক্লুতে সয়লাব হয়ে যায়। কেস সলভ করা তখন পানির মতো সোজা হয়ে যায়।"

টুনি এখনো কিছু বলল না। ছোটাচ্চু তখন আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সেটা আগেরটা থেকেও লম্বা, তারপর বলল, "কিন্তু এই কেসটায় কোনো ক্লু নাই। ষোলকোটি মানুষের মাঝ থেকে একজনকে খুঁজে বের করা কি সোজা কথা? যদি খালি একটা ক্লু থাকত—"

টুনি বলল "একটা ক্লু তো আছে।"

ছোটাচ্চু সোজা হয়ে বসে বলল, "কী ক্লু?"

"সুমন তার ল্যাপটপ নিয়ে গেছে—তার মানে নিশ্চয়ই ইন্টারনেটে হাজির আছে!"

"ইন্টারনেটে বাংলাদেশের কতো মানুষ আছে তুই জানিস?"

"কিন্তু সুমনের তো একটা আলাদা সখ আছে। সেই সখটা তো খুব বেশি মানুষের নাই।"

"কী সখ?"

"বিজ্ঞান! তার মানে ইন্টারনেটে যারা বিজ্ঞান নিয়ে ঘাটাঘাটি করে তার মাঝে নিশ্চয়ই সুমন আছে।"

"থাকলে আছে। কিন্তু আমি খুঁজে বের করব কেমন করে?"

টুনি সুমনের ডাইরিটা হাতে নিয়ে বলল, "এই যে এই ডাইরিটা দিয়ে!"

"এই ডাইরিটা দিয়ে? কীভাবে?"

"এর মাঝে অনেক প্রশ্ন। তার মানে সুমন এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে। তুমি এই প্রশ্নগুলো তোমার নিজের মতো করে ইন্টারনেটে দাও। জিজ্ঞেস কর। তাহলে একদিন যখন সুমনের চোখে পড়বে সে উত্তর দেবে।"

"সুমনের চোখে যদি না পড়ে?"

"তোমার পরিচিত একজন আছে না যে এইগুলো খুব ভালো বুঝে, তোমার ইনফেকশানওয়ালা ওয়েব সাইট তৈরি করে দিয়েছে?"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "মোটেই ইনফেকশানওয়ালা না—"

"ঠিক আছে। তুমি সেই ছেলেকে বল সে যেন তোমার প্রশ্নগুলো এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয় যেন অনেক মানুষের চোখে পড়ে। সে নিশ্চয়ই পারবে।"

ছোটাচ্চুর মুখে প্রথমে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব চলে এল, আস্তে আস্তে তাচ্ছিল্যের ভাবটা চলে সেখানে উৎসাহের ভাব চলে আসতে থাকে। তারপর তার চোখ মুখ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, হাতে কিল দিয়ে বলে, "টুনটুনি! তুই একটা জিনিয়াস।"

টুনি বলল, "তোমার সাথে তুলনা করলে যে কোনো মানুষ জিনিয়াস।"

ছোটাচ্চু তখন তখনই কাজে লেগে গেল। সে যেহেতু বিজ্ঞানের "ব" পর্যন্ত জানে না, তাছাড়া বিজ্ঞান নিয়ে তার একটা এলার্জির মতো ভাব আছে তাই সে সুমনের ডাইরিটা নিয়ে গেল তার বিজ্ঞান জানা একজন বন্ধুর কাছে। সে ডাইরি থেকে বেছে বেছে দশটা প্রশ্ন নিয়ে সেটা টাইপ করিয়ে নিল, তারপর সেগুলো নিয়ে গেল তার ইন্টারনেটের এক্সপার্টের বন্ধুর কাছে। সে ব্যবস্থা করে দিল যেন ইন্টারনেটে তার প্রশ্নগুলো অনেকে দেখতে পায়। যারা প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় তাদেরকে উত্তর পাঠাবার জন্যে একটা ই-মেইল ঠিকানা দিয়ে রাখা হল। তারপর ছোটাচ্চু সেই ই-মেইলে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রায় সাথে সাথেই উত্তর আসতে শুরু করে। বেশির ভাগই বাচ্চা, কেউ কেউ উত্তর হিসেবে কিছু একটা লিখে পাঠিয়েছে, কেউ কেউ জানতে চেয়েছে

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে ছোটাচ্চু কী করবে। দ্বিতীয় দিনে ছোটাচ্চু সুমনের কাছ থেকে উত্তর পেলো। ই-মেইল ঠিকানা বা চিঠির শেষে কোথাও সুমনের নাম লেখা নেই কিন্তু ছোটাচ্চুর বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না এটা সুমন। কারণ এখানে লেখা

"এই দশটা প্রশ্ন দেখে আমি খুবই অবাক হয়েছি কারণ এই প্রশ্নগুলো আমারও প্রশ্ন। আমি কয়েকটার উত্তর চিন্তা করে বের করেছি। অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করার চেষ্টা করছি। তুমি বের করতে পারলে আমাকে জানিও।"

চিঠিটা পেয়ে ছোটাচ্চুর উত্তেজনার শেষ নেই। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে উত্তর পাঠালো

"তুমি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করেছ, সেগুলো কি আমাকে পাঠাবে?"

উত্তরে সুমন লিখল

"পাঠালাম।"

ছোটাচ্চু লিখল

"ফ্যান্টাস্টিক। তুমি কী কর? কলেজ ইউনিভার্সিটির মাস্টার?"

সুমন লিখল

"হা হা হা। আমি কলেজ ইউনিভার্সিটির মাস্টার না। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকব।"

ছোটাচ্চু অবশ্যি শুধু ই-মেইল চালাচালি করে বসে রইল না, ইউনিভার্সিটির কয়েকজনের সাথে কথা বলে দুইটা প্রশ্নের উত্তর বের করে নিয়ে এসে সুমনকে লিখল

"আমি আরো দুইটা প্রশ্নের উত্তর বের করেছি। তুমি কি দেখতে চাও?"

সুমন লিখল

"অবশ্যই।"

ছোটাচ্চু তখন অনেক চিন্তাভাবনা করে লিখল

"হাতে লেখা উত্তর। ই-মেইলে কেমন করে পাঠাব?"

সুমন লিখল

"স্ক্যান করে পাঠাতে পার।"

ছোটাচ্চু লিখল

"ধারে কাছে স্ক্যানার নাই। তোমার বাসা কোথায়? ধারে কাছে হলে হাতে হাতে দিতে পারি।"

সুমন পুরো একদিন এর উত্তর দিল না। তারপরে লিখল

"তুমি কে? কী কর?"

ছোটাচ্চু তখন বিপদে পড়ে গেল। সে এখন কী লিখবে? যখন চিন্তা করতে করতে ঘেমে গেল তখন টুনি তাকে সাহায্য করল। বলল, "লিখ তুমি বিজ্ঞানের একটা বই লেখার চেষ্টা করছ। সেইজন্যে বিজ্ঞানের মজার মজার প্রশ্ন আর তার উত্তর খুঁজে বের করছ।"

ছোটাচ্চু চিন্তিত মুখে বলল, "যদি আমাকে বিজ্ঞানের কোনো একটা প্রশ্ন করে বসে?"

"সামনা সামনি তো তোমাকে পাচ্ছে না! কেমন করে প্রশ্ন করবে?"

ছোটাচ্চু বলল, "তা ঠিক।" তারপর সুমনকে লিখল

"আমি একটা বিজ্ঞানের বই লিখছি। বই মেলায় বের করার ইচ্ছা। সেই জন্যে মজার মজার প্রশ্ন আর উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

সুমন লিখল

"আমার কাছে আরো মজার প্রশ্ন আছে।"

ছোটাচ্চু লিখল

"আমাকে দিবে?"

সুমন লিখল

"হাতে লেখা প্রশ্ন। আমার কাছেও স্ক্যানার নাই। হা হা হা।"

ছোটাচ্চু আবার তার বাসা বের করার চেষ্টা করল

"তোমার বাসা কোথায়? কাছাকাছি হলে হাতে হাতে দিতে পার।"

সুমন যেখানেই তার বাসা লিখুক না কেন ছোটাচ্চু লিখবে তার বাসা ঠিক সেখানেই। তারপর সেখানে চলে যাবে। কিন্তু সুমন তাকে বিপদে ফেলে দিল, পাল্টা প্রশ্ন করল

"তোমার বাসা কোথায়?"

এখন তার বাসা যদি কাছাকাছি না হয় তাহলে তো বিপদ হয়ে যাবে। টুনি আবার তাকে সাহায্য করল, বলল, "ছোটাচ্চু, তুমি তোমার বাসাটা কোথায় লিখ। যদি তার বাসা থেকে দূরে হয় তখন ভান করবে ঠিক সেখানে একটা কাজে গিয়েছ!"

ছোটাচ্চু লিখল

“আমার বাসা মিরপুর।”

সুমন লিখল

“আমার বাসা উত্তরা। সরি।”

ছোটাচ্চু হাতে কিল দিয়ে বলল, “অন্তত বাসাটা কোথায় বের করে ফেলেছি! সুমন উত্তরাতে আছে!”

টুনি বলল, “এখন তুমি লিখ কাল পরশু তুমি উত্তরা যেতে পার। তখন ইচ্ছে করলে তুমি তাকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পার, তার প্রশ্নগুলো নিতে পার। বেশি উৎসাহ দেখিও না, তাহলে সন্দেহ করবে।”

ছোটাচ্চু লিখল

“উত্তরাতে আমার ডেন্টিস্ট এপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি কাল উত্তরা যাব। তুমি চাইলে তখন দিতে পারি।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “এতো কিছু থাকতে ডেন্টিস্ট এপয়ন্টমেন্টের কথা কেন বলছ?”

ছোটাচ্চু হা হা করে হেসে বলল, “বুঝলি না? ভান করব দাঁতে ব্যথা, কথা বলতে পারছি না। বিজ্ঞানের প্রশ্ন যদি করে ফেলে ধরা পড়ে যাব না?”

সুমনকে শেষ পর্যন্ত টোপ খাওয়ানো গেল। সে উত্তরার একটা ফাস্ট ফুডের দোকানের ঠিকানা দিয়ে বলল, “সন্ধ্যেবেলা সেখানে গেলে সে তার মজার প্রশ্নগুলো দিয়ে যাবে।” সেই ই-মেইলটি পেয়ে সুমন একটা গগনবিদারী চিৎকার দিল এবং সেই চিৎকার শুনে ছোটদের সাথে সাথে বড়রাও চলে এল! বড়রা যখন বুঝল কোনো বিপদ আপদ হয়নি তখন যে যার মতো চলে গেল শুধু বাচ্চারা থেকে গেল।

একজন জিজ্ঞেস করল, “পালিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে খুঁজে পেয়েছ?”

ছোটাচ্চু বুকে থাবা দিয়ে বলল, “ইয়েস। কাল সন্ধ্যায় দেখা হবে!”

আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “কেমন করে খুঁজে বের করলে ছোটাচ্চু?”

ছোটাচ্চু গম্ভীর মুখে বলল, “এটা একই সাথে বুদ্ধি, মেধা, বিশ্লেষণ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং কঠোর পরিশ্রমের ফসল।”

ছোটাচ্চুর গম্ভীর মুখ দেখে বাচ্চারাও মুখ গম্ভীর করে মাথা নাড়ল। শুধু টুনি মুখ টিপে হাসল।

শান্ত জিজ্ঞেস করল, “কালকে যখন দেখা হবে, তখন তুমি কী করবে?”

ছোটাচ্চু বলল, “আমি তখন তার বাবাকে জানাব। বাবা সেই ফাস্ট ফুডের দোকানে অপেক্ষা করবে, আমি যখন সুমনের সাথে কথা বলব তখন

তার বাবা এসে ক্যাঁক করে ধরে ফেলবে।" ছোটাচ্চু আনন্দে হা হা করে হাসল। বাচ্চারা কেউ তার হাসিতে যোগ দিল না।

টুনি বলল, "কালকে তার বাবাকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"যদি কোনো কারণে সুমন না আসে তাহলে তুমি লজ্জা পাবে। তুমি যদি তার ঠিকানাটা বের করে আনতে পার, তাহলে সেই ঠিকানাটা পরে যে কোনো সময়ে তার আব্বুকে দিতে পারবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ঠিকই বলেছিস। কালকে কোথায় থাকে দেখে আসি। যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হব, তখন জানাব।"

সবাই চলে গেলে টুনি বলল, "ছোটাচ্চু।"

"কী হল?"

"কালকে তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যেয়ো।"

"তোকে? কেন?"

"তুমি যদি সুমনের পিছনে পিছনে যাওয়ার চেষ্টা কর, সে বুঝে যাবে। তাই তুমি বসে থাকবে। আমি ওর বাসাটা চিনে আসতে যাব।"

"তু-তুই!"

"হ্যাঁ। আমি তোমার এসিস্টেন্ট। মনে আছে?"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, "তুই যাবি?"

"হ্যাঁ। সমস্যা কোথায়?"

ছোটাচ্চু চিন্তা করে দেখল আসলে সেরকম সমস্যা নেই। রাস্তাঘাটে শতশত মানুষ হাঁটাহাঁটি করে তার মাঝে একটা বাচ্চা মেয়ে তো হেঁটে হেঁটে যেতেই পারে। ছোটাচ্চু তো একেবারে একা ছেড়ে দিচ্ছে না, সে তো আশেপাশেই আছে। সময়টা সন্ধেবেলা যখন সব মানুষজন হাঁটাহাঁটি করে।

সন্ধ্যাবেলা ছোটাচ্চু ফাস্টফুডের দোকানে ঢোকার আগে তার মুখে কিছু তুলা ঢুকিয়ে নিল যেন মুখের বাম পাশটা একটু ফুলে থাকে। ডেন্টিস্টের কাছে যারা যায় তাদের দাঁতে ব্যথা থাকে, মুখ ফুলে থাকে। টুনি কোথায় অপেক্ষা করবে সেটা আগে থেকে ঠিক করা ছিল না, কিন্তু কপাল ভালো রাস্তার ঠিক উল্টোপাশে একটা বইয়ের দোকান পেয়ে গেল। টুনি সেখানে বই দেখতে দেখতে চোখের কোণা দিয়ে ছোটাচ্চুকে লক্ষ করতে লাগল।

ঠিক সাতটার সময় চোখে চশমা হালকা-পাতলা একটা ছেলে হাতে কিছু কাগজ নিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকানে ঢুকল। ছোটাচ্চু আর টুনি দুজনেই ছেলেটাকে চিনতে পারল, তার বাবা এই ছেলেটারই ছবি দিয়েছেন। ছেলেটা সুমন।

সুমন ফাস্ট ফুডের দোকানে যারা বসে খাচ্ছে তাদের সতর্ক চোখে লক্ষ করে, বোঝাই গেল বিজ্ঞান লেখককে খুঁজছে। তখন ছোটাচ্চু হাত নেড়ে তাকে ডাকল। সুমন ছোটাচ্চুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি কি বিজ্ঞান লেখক?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "গাবা গাবা গাবা—"

দাঁত ব্যথা সেজন্যে মুখ খুলে কথা বলতে পারছে না, এরকম ভান করে অভিনয় করতে গিয়ে কোনো শব্দই বের হল না, অসতর্কভাবে এরকম বিচিত্র কথা বলে ফেলেছে!

সুমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, বলল, "কী বললেন?"

ছোটাচ্চু হাত দিয়ে তার মুখ দেখিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল যে তার দাঁতে ব্যথা তাই কথা বলতে পারছে না, অস্পষ্ট ভাবে বলল, "আমা দাঁতা বাথা—কাথা বালতা পারা না।"

"আপনার দাঁতে ব্যথা? কথা বলতে পারেন না?"

ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, সুমন বলল, "তাহলে কথা বলার দরকার নেই। এই যে আমার প্রশ্ন।" বলে সে কাগজগুলো ছোটাচ্চুর দিকে এগিয়ে দিল।

ছোটাচ্চু প্রশ্নগুলো নিয়ে তার কাগজগুলো এগিয়ে দিয়ে আবার দাঁত ব্যথার জন্যে কথা বলতে না পারার কারণে কষ্ট করে কথা বলার অভিনয় করল, "তামার পাশ্নার আত্তার।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর?"

ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "চা কাফা খাবা?"

সুমন মাথা নাড়ল, "না, আমি চা কফি খাব না। আমি যাই।" বলে এদিক সেদিক তাকিয়ে ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে বের হয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার পিছন ফিরে দেখল, ছোটাচ্চু বের হয়নি তাই সে সন্দেহজনক কিছু পেল না। টুনি পিছনেই ছিল তাকে সে মোটেও সন্দেহ করল না। একটু সামনেই একটা ছয়তলা বিল্ডিংয়ের ভেতর সুমন তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল। টুনি বিল্ডিংটা পার হয়ে গিয়ে আবার ঘুরে এলো।

ছোটাচ্চু ততক্ষণে ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে বের হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। টুনিকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "বাসাটা দাখা আসাছাস?"

টুনি বলল, "তোমার এখন আর দাঁত ব্যথার ভান করতে হবে না। ঠিক করে কথা বলতে পার।"

ছোটাচ্চুর হঠাৎ করে সেটা মনে পড়ল, তখন মুখের ভিতর থেকে তুলাটা বের করে আবার জিজ্ঞেস করল, "বাসাটা দেখে এসেছিস?"

"হ্যাঁ। কাছেই ছয়তলা বিল্ডিং। বাসার নম্বর তেতাল্লিশ!"

"গুড! ফ্যান্টাস্টিক। আয় বাসায় যাই।"

টুনি কথা না বলে ছোটাচ্চুর সাথে হাঁটতে থাকে।

ছোটাচ্চু হাতে কিল দিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, "আকবর হোসেনকে ফোন করে বলতে হবে তার ছেলের খোঁজ পেয়েছি। অসাধারণ!"

টুনি কোনো কথা বলল না।

"ডলি খালার কেসটা গুবলেট হয়ে গিয়েছিল। এইটা হয় নাই।"

টুনি এবারেও কোনো কথা বলল না। ছোটাচ্চু বলল, "কতো টাকা বিল করা যায় ঠিক করতে পারছি না। কম করা যাবে না আবার বেশিও করা যাবে না। প্রতি ঘণ্টার একটা হিসাব দিতে হবে। কী বলিস?"

টুনি এবারেও কোনো কথা বলল না। ছোটাচ্চু উৎসাহে টগবগ করতে থাকে হাতে আরেকটা কিল দিয়ে বলল, "বাবাটা কতো খুশি হবে!"

টুনি ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সুমনের বাবা এখন কী করবে ছোটাচ্চু?"

"ধরে বাসায় নিয়ে যাবে।"

"তারপর কী করবে?"

"বাপটা একটু কঠিন টাইপের মানুষ মনে হল। ধরে পিটুনি দিতে পারে।"

"তারপর?"

"তারপর নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি করে দিবে?"

"তার মানে সুমন আর বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না?"

"মনে হয় পারবে না। বাবাটা খুবই কঠিন মানুষ।"

টুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বাসায় পৌঁছানোর সাথে সাথে টুনি কয়েক সেকেন্ডের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোটাচ্চু যখন বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে আকবর হোসেনকে ফোন

করার জন্যে ফোনটা নিয়েছে তখন হঠাৎ তার ঘরে সব বাচ্চা কাচ্চা হাজির হল। তাদের মুখ থমথম করছে। ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "তোদের কী হয়েছে?"

বাচ্চাদের ভিতরে বড় একজন বলল, "ছোটাচ্চু তুমি ফোনটা রাখ।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "ফোনটা রাখব? কেন?"

টুনি বলল, "তোমার সাথে কথা আছে।"

"কথা থাকলে কথা বলবি। এখন বিরক্ত করিস না। যা সবাই। ভাগ।"

বাচ্চাগুলো যাবার কোনো লক্ষণ দেখাল না বরং আরেকটু এগিয়ে এল। শান্ত বলল, "আমাদের কথা আছে ছোটাচ্চু।"

"ফোনটা করে নিই। জরুরি ফোন।"

"উঁহু। ফোন করার আগে কথা। আমরা তোমাকে ফোন করতে দিব না।"

ছোটাচ্চু এবারে সত্যি সত্যি রেগে গেল, "আমাকে ফোন করতে দিবি না? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি?"

টুনি বলল, "তোমার নিজের ভালোর জন্যে বলছি।"

"আমার নিজের ভালোর জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"কী রকম?"

"তুমি এখন সুমনের আব্বুকে ফোন করতে যাচ্ছ। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ফোন করে তুমি ঠিকানাটা দিবে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ঠিকানাটা জান?"

"জানব না কেন? তুই পিছন পিছন গিয়ে দেখে এসেছিস মনে নাই? তেতাল্লিশ নম্বর ছয় তলা বিল্ডিং।"

"আমি তোমাকে সত্যিকারের ঠিকানাটা বলি নাই।"

ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললি?"

"তুমি শুনেছ আমি কী বলেছি?"

ছোটাচ্চু রাগের চোটে কথাই বলতে পারছিল না। কোনোভাবে বলল, "তু-তু-তুই?"

বাচ্চাদের ভিতরে যে বড় সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমরা সবাই সুমনের পক্ষে। আমরা সুমনকে তার বাবার হাত থেকে রক্ষা করব।"

ছোটাচ্চু রাগের চোটে তোতলা হয়ে গেল, বলল, "র-র-র-ক্ষা করবি? বা-বা-বাবার হাত থেকে?"

"হ্যাঁ।"

ছোট একজন বলল, "আমরা সুমন ভাইয়ার জন্য টাকা তুলতে শুরু করেছি, এর মাঝে সাতাইশ টাকা উঠে গেছে।"

আরেকজন বলল, "বিশ্বাস না করলে তুমি গুনে দেখো।" একজন ছোটো একটা কৌটা তার দিকে এগিয়ে দেয়, সত্যি সত্যি তার ভেতরে দুমড়ানো মোচড়ানো কিছু টাকা।

ছোটাচ্চুর টাকাগুলো গুনে দেখার ইচ্ছে আছে বলে মনে হল না। চোখ পাকিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে রইল। শান্ত বলল, "আমরা সবাই চাই সুমন ভাইয়া বৈজ্ঞানিক হোক। বৈজ্ঞানিক হয়ে এমন যন্ত্র আবিষ্কার করুক যেইটা দিয়ে স্বৈরাচারী বাবাদের শাস্তি দেওয়া যায়।"

একজন শুদ্ধ করে দিল, "বাবা আর মা।"

আরেকজন, যার লেখাপড়া করার বেশি উৎসাহ নাই, বলল, "এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করবে যেটা দিয়ে লেখাপড়া করতে হবে না, মাথার মাঝে নিজে নিজে লেখাপড়া ঢুকে যাবে।"

টুনি বলল, "তাই তুমি এখন সুমন ভাইয়ার বাবার পক্ষে কাজ করতে পারবে না। সুমন ভাইয়ার পক্ষে কাজ করতে হবে।"

ছোটাচ্চু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না, বলল, "যদি না করি?"

শান্তর মুখে একটা ফিচলে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "তুমি করবে ছোটাচ্চু।"

"তোর কেন সেটা মনে হচ্ছে?"

"তার কারণ তুমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাও যে জিনিসটাকে আমরা সেইটা ধরে এনেছি!"

ভয় ডর নেই সেইরকম একজন দেখালো ডান হাতে সে গোবদা একটা মাকড়শা ধরে রেখেছে। মাকড়শাটা জীবন্ত এবং ছুটে যাবার জন্যে কিলবিল করে নড়ছে। সে মাকড়শাটা ধরে রেখে ছোটাচ্চুর দিকে এগিয়ে যাবার ভান করল। ছোটাচ্চু ভয়ে আতংকে চিৎকার করে লাফ দিতে গিয়ে চেয়ারের সাথে ধাক্কা খেয়ে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পানির গ্লাসটা নিচে ফেলে একটা তুলকালাম কাণ্ড করে ফেলল।

ভয় ডর নেই সেই ছেলেটার হাতে আটকা পড়া মাকড়শাটা কিলবিল করে নড়ছে সেই দৃশ্য দেখে ছোটাচ্চুর প্রায় হার্টফেল করার মতো অবস্থা হল। ছোটাচ্চু গড়িয়ে ঘরের এক কোনায় গিয়ে দুই হাত সামনে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, "না, না, না, না—"

ছেলেটা থমথমে গলায় ভয় দেখিয়ে বলল, "তুমি যদি সুমন ভাইয়ার জন্যে কাজ না কর তাহলে এই মাকড়শাটা আমি তোমার গায়ে ছেড়ে দিব।"

শান্ত বলল, "মাকড়শাটা এখনো জ্যান্ত, সেটা তোমার শরীরের উপর দিয়ে তিড় তিড় করে হেঁটে যাবে।"

আরেকজন বলল, "হয়তো তোমার কানের ফুটো দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে।"

আরেকজন বলল, "আমাদের রান্নাঘরে এর চাইতে বড় একটা মাকড়শা আছে। পেটে বিস্কুটের মতো একটা ডিম। এরপরে সেইটাও ধরে আনব।"

ছোটাচ্চু দুই হাত জোড় করে বলল, "প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! মাকড়শাটা সরিয়ে নিয়ে যা। তোরা যা বলছিস সব শুনব। সব শুনব।"

মাকড়শা হাতে ভয় ডরহীন ছেলেটা বলল, "বল, খোদার কসম।"

ছোটাচ্চু বলল, "খোদার কসম।"

"এতো আস্তে বলছ কেন? জোরে বল।"

ছোটাচ্চু প্রায় চিৎকার করে বলল, "খোদার কসম!"

তখন মাকড়শা হাতের ছেলেটা তার হাতটা নামিয়ে একটু পিছিয়ে আসে। ছোটাচ্চু ভাঙা গলায় বলল, "প্লিজ সোনামণি মাকড়শাটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে হাতটা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল। প্লিজ!"

"তুমি আগে বল কীভাবে কী করবে। তার পরে।"

ছোটাচ্চু ভাঙা গলায় বলল, "আমাকে বিশ্বাস কর। আমিও সুমনের পক্ষে। আয় সবাই মিলে ঠিক করি কী করা যায়। আগে মাকড়শাটা ফেলে দিয়ে আয়। প্লিজ।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

ভয় ডর হীন ছেলেটা মাকড়শাটা বাইরে ছেড়ে দিতে গেল আর ছোটাচ্চু ভয়ে ভয়ে তার বিছানায় উঠে বসল।

শান্ত বলল, "এখন বল তুমি কী করবে।"

ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, "আমার মনে হয় ইয়ে মানে—"

টুনি বলল, “তুমি ফারিহা আপুকে ফোন কর। ফোন করে তার কাছ থেকে বুদ্ধি নাও। ফারিহা আপুর মাথায় চিকন বুদ্ধি। তোমার বুদ্ধি মোটা।”

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ ফারিহা আপুর মাথায় চিকন বুদ্ধি।”

ছোটাচ্চু বলল, “ঠিক আছে আমি তাহলে ফারিহার সাথে কথা বলব।”

টুনি বলল, “এখনই বল। সবার সামনে বল।”

ছোটাচ্চু বলল, “তোরা আমাকে বিশ্বাস করছিস না?”

“করছি। কিন্তু আমরা ফারিহা আপুকে আরো বেশি বিশ্বাস করি।”

ছোটাচ্চু তখন মুখটা একটু ভোতা করে ফারিহাকে ফোন করল। প্রায় সাথে সাথে ফোন ধরে ফারিহা বলল, “কী খবর? কেস সলভ হয়েছে?”

“হ্যাঁ হয়েছে।”

“কংগ্রাচুলেশন। তুমি তাহলে সত্যি ডিটেকটিভ হয়ে যাচ্ছ। ওয়ান্ডারফুল। বাংলাদেশের শার্লকস হোম।”

ছোটাচ্চু বলল, “কেস সলভ হওয়ার পর একটা নতুন কেস হয়েছে।”

“নতুন কেস? সেটা কী রকম?”

ছোটাচ্চু ইতস্তত করে বলল, “আমাদের বাসার বাচ্চা কাচ্চাদের তো তুমি জান! তারা সবাই এসে আমাকে ধরেছে আমি যেন সুমন ছেলেটিকে তার বাবার কাছে ধরিয়ে না দেই।”

“ঠিকই তো বলেছে। আমিও কখনো চাইনি এই রকম একটা বাবা জোর করে তার ছেলের উপর সবকিছু চাপিয়ে দিবে।”

ছোটাচ্চু বলল, “বাচ্চারা সবাই চাইছে তোমার সাথে কথা বলে আমরা বাবার হাত থেকে ছেলেটাকে রক্ষা করি।”

“তাই চাইছে?”

“হ্যাঁ। এরা সুমনের জন্যে একটা ফান্ডও তোলা শুরু করেছে। এর মাঝে সাতাইশ টাকা উঠে গেছে।”

“ওদেরকে বলো আমি তাদের ফান্ডে আরো সাতাইশ টাকা দিয়ে দিলাম। সাতাইশ প্লাস সাতাইশ ইকুয়েলস্ টু চুয়ান্ন।”

“বলব। এখন কী করা যায় বল।”

ফারিহা বলল, “ছেলেটার ঠিকানা যেহেতু আমরা পেয়ে গেছি এখন সেইটা দিয়েই তার বাবাকে টাইট করা যাবে।”

“কীভাবে?”

“একশ একটা উপায় আছে। কাল বিকালে চল তার বাবার বাসায় যাই।”

"তুমিও যাবে?"

"কেন নয়। মহৎ কাজে আমাকে কখনো পিছিয়ে যেতে দেখেছ?"

ছোটাচ্চু বলল, "তা দেখি নাই। কিন্তু তুমি যেগুলো কাজকে মহৎ কাজ বল তার সবগুলিও মহৎ কি না সেটা নিয়ে আলোচনা করা যায়।"

ফারিহা বলল, "ঠিক আছে।"

ফোনটা রাখার পর বাচ্চারা আনন্দের শব্দ করল। টুম্পা বলল, "ছোটাচ্চু তোমার মুখটা একটু নিচে নামাবে?"

"কেন?"

"তোমার গালে আদর করে একটা চুমু দিয়ে দিই। তুমি খুবই সুইট।"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ ছোটাচ্চু। তুমি খুবই সুইট। আসাধারণ। পৃথিবীর বেস্ট ছোটাচ্চু।" ছোটাচ্চু মুখটা নামাল, তখন শুধু টুম্পা নয় তার সাথে সাথে অন্য সবাইও তার গালে ধ্যাবড়া করে একটা চুমু দিয়ে দিল।

ছোটাচ্চু আর ফারিহা গাড়ি থেকে নেমে আকবর হোসেনের দরজায় বেল বাজাল। প্রায় সাথে সাথেই আকবর হোসেন দরজা খুললেন, ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এসো শাহরিয়ার। তুমি বলেছ খবর আছে, আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।"

ছোটাচ্চু বলল, "এ হচ্ছে ফারিহা। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। আজকে আমার সাথে জোর করে চলে এল।"

সাংবাদিক শুনে আকবর হোসেন কেমন যেন থিতিয়ে গেলেন, দুর্বল গলায় বললেন, "আসেন, ভিতরে আসেন।"

দুইজন ভিতরে গিয়ে বসার আগেই সুমনের মা আর বোন ঘরে ঢুকল। সুমনের মা এক ধরনের ব্যাকুল গলায় বললেন, "আমার ছেলেটার খোঁজ পেয়েছ বাবা?"

ছোটাচ্চু বলল, "জি বলছি। আপনি বসেন।"

ভদ্রমহিলা বসলেন, তার মেয়েটি মাকে ধরে পাশে বসে পড়ল। আকবর হোসেনও বসলেন, তার মুখে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী ছাপ ফুটে উঠেছে।

ছোটাচ্চু বলল, "আমার ধারণা আপনাদের ছেলেকে আমরা খুঁজে বের করতে পেরেছি—"

ভদ্রমহিলা ব্যাকুল গলায় বললেন "কোথায় আছে? কোথায়? কেমন আছে?"

মেয়েটা চিৎকার করে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

ছোটাচ্চু বলল, "বলছি, কিন্তু এই কেসটা নিয়ে আমি একটা সমস্যায় পড়ে গেছি।"

আকবর হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমস্যা?"

"আমার কাজের জন্যে সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। সাংবাদিকেরা এটার খোঁজ পেয়ে গেছে, এখন তারা এটা নিয়ে একটা স্টোরি করতে চায়। পজিটিভ স্টোরি করলে আমার কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু স্টোরিটা নেগেটিভ, আমি যখন আমার ডিটেকটিভ এজেন্সিটাকে দাঁড়া করতে চাইছি এই সময়ে যদি নিগেটিভ স্টোরি করে—"

ফারিহা এই সময় ছোটাচ্চুকে থামিয়ে বলল, "আমি বিষয়টা বুঝিয়ে বলি। স্টোরি নেগেটিভ হয় না, পজিটিভও হয় না। স্টোরি হয় সত্যি। কাজেই আমরা সত্যি কথাটা বলতে চাই। সত্যি কথা হচ্ছে একটা মেধাবি ছেলে বিজ্ঞানকে ভালোবাসে কিন্তু তার পরিবার তাকে বিজ্ঞান পড়তে দিবে না। তাকে বলা হয়েছে যদি তাকে বিজ্ঞান পড়তে হয়, নিজের উপার্জনে পড়তে হবে। ছেলেটি বিজ্ঞানকে এতো তীব্রভাবে ভালোবাসে যে, সে বাসা ছেড়ে চলে গেছে নিজে নিজে উপার্জন করে পড়ছে। আমরা এই সত্যি কথাটা বলতে চাই। যে পরিবার তাকে ঘর ছাড়া করেছে—"

সুমনের মা তীব্র গলায় চিৎকার করে বললেন, "মা, তুমি পরিবার বল না। আমরা কিছু করিনি, সবকিছু করেছে সুমনের বাবা—" আঙুল দিয়ে আকবর হোসেনকে দেখিয়ে বললেন, "এই বাবা। আমরা কতো বোঝানোর চেষ্টা করেছি। বুঝে নাই। ছেলেটাকে ঘর ছাড়া করেছে।"

ফারিহা ব্যাগ থেকে একটা নোট বই বের করে দ্রুত লিখতে থাকে, মুখ গম্ভীর করে বলল, "তাহলে বাবার একার ইচ্ছা? এখানে পরিবারের অন্য সদস্যদের মতামতের কোনো গুরুত্ব নাই?"

আকবর হোসেন অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বললেন, "আমি ঠিক এই সব ব্যক্তিগত তথ্য পত্র পত্রিকায় দেখতে চাই না।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমিও চাই না। কিন্তু এখন সাংবাদিকেরা খবর পেয়ে গেছে। আমার পিছনে চিনে জোঁকের মতো লেগে গেছে—"

ফারিহা হুংকার দিয়ে ছোটাচ্চুকে বলল, "আপনি কী বললেন? আমাকে চিনে জোঁক বললেন?"

ছোটাচ্চু বলল, "না মানে ইয়ে—আক্ষরিক ভাবে বলি নাই। কথার কথা বলতে গিয়ে—"

ফারিহা আরো জোরে হুংকার দিল, "কথার কথা বলতে গিয়ে আপনি অপমান সূচক কথা বলবেন? আপনি এই মুহূর্তে কথাটা প্রত্যাহার করেন তা না হলে আপনার বিরুদ্ধে, আপনার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিব।"

ফারিহার অভিনয় দেখে ছোটাচ্চু মুগ্ধ হল। সেও অভিনয়ের চেষ্টা করতে লাগল, বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি চিনে জোঁক কথাটা প্রত্যাহার করলাম। আমি বরং বলি আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করছেন।"

ফারিহা মুখ শক্ত করে বলল, "থ্যাংকু।"

ছোটাচ্চু আবার আকবর হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে আমি বিপদের মাঝে পড়ে গেছি। সাংবাদিকেরা পত্রিকায় রিপোর্ট করার সময় আমার নাম দিয়ে দেবে, সবাইকে বলবে আমি টাকার বিনিময়ে মেধাবী বিজ্ঞান পিপাসু একটা ছেলেকে তার নিষ্ঠুর বাবার হাতে তুলে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমার একটা খারাপ পাবলিসিটি হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না।"

আকবর হোসেন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী চান?"

"আপনি এই সাংবাদিকের বোঝান তারা যেন এই স্টোরিটা না করে।"

ফারিহা মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, "আপনার ধারণা আপনারা চাইলেই আমরা সাংবাদিকেরা সত্যি প্রকাশ করা বন্ধ রাখব? আপনি কি জানেন আমাদের দেশে বাচ্চাদের তাদের বাবা মায়েরা কী পরিমাণ যন্ত্রণার মাঝে রাখে? তাদেরকে কী পরিমাণ চাপ দেয়? কী রকম ভয়ংকর প্রতিযোগিতার মাঝে ঠেলে রাখে? এটা তো শুধু একটা স্টোরি না—এরকম অনেক স্টোরি আমাদের কাছে আছে। আমরা একটা একটা করে প্রকাশ করব।"

ফারিহা কথা বলছিল একটু ঢং করে, ভাবটা ছিল একটা ন্যাকা ন্যাকা। এর আগেও সে একবার ফোনে আকবর হোসেনের সাথে কথা বলেছিল, সে খুব সতর্ক যেন আকবর হোসেন গলার স্বর শুনে তাকে চিনে না ফেলে।

সুমনের ছোট বোনটি এতক্ষণ কোনো কথা না বলে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে সবার কথা শুনছিল। এই প্রথম সে কথা বলার চেষ্টা করল, তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আব্বু, আমি একটা কথা বলি?"

"কী কথা?"

"তুমি ভাইয়াকে বল তার যেটা ইচ্ছা সে পড়তে পারবে। তুমি বল ভাইয়া যদি সায়েন্টিস্ট হয় তাহলে তুমি খুব খুশি হবে। তাহলেই এই সাংবাদিকেরা কিছু লিখবেন না।" মেয়েটি ফারিহার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না আপু?"

ফারিহা বিভ্রান্ত হয়ে যাবার খুব চমৎকার একটা অভিনয় করল, তারপর বলল, "হ্যাঁ, তাহলে এই কেসটা নিয়ে অবশ্যি লিখতে পারব না। কিন্তু আমাদের অন্য অনেক কেস আছে। সেগুলো নিয়ে লিখব।"

মেয়েটা বলল, "সেগুলো নিয়ে লিখেন, বেশি বেশি করে লিখেন।" তারপর আবার তার আব্বুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চল আব্বু আমরা সবাই গিয়ে ভাইয়াকে নিয়ে আসি।"

সুমনের আম্মু আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। আকবর হোসেন গলা পরিষ্কার করে বললেন, "আসলে কাজটা আমি বেকুবের মতোই করেছি। নিজের ছেলেকে বুঝতে পারি নাই এরকম একটা বাবা কেমন করে হলাম? চল সবাই মিলে যাই। গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে আসি।"

উত্তরার সাতাশ নম্বর বাসাটির (তেতাল্লিশ নয়!) ছয় তলায় একটা ছোট রুমে সুমন আর আরো দুজন ছেলে যখন ফ্লোরে খবরের কাগজ বিছিয়ে আলুভর্তা আর সেদ্ধ ডিম দিয়ে ভাত খাচ্ছিল ঠিক তখন আকবর হোসেন তার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তাদেরকে দেখে সুমন প্রথমে চমকে উঠল, তারপর তার ছেলেমানুষী মুখটা হঠাৎ করে কঠিন হয়ে গেল।

আকবর হোসেন বললেন, "বাবা! আমার উপর রাগ করিস না। বাসায় চল। আমি কথা দিচ্ছি তোর যেটা ইচ্ছা তুই পড়বি। তুই চাইলে তোকে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে পি. এইচ. ডি করতে পাঠাব।"

সুমন কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে সবার দিকে তাকাল। আকবর হোসেন বললেন, "চল বাবা। বাসায় চল।"

সুমন খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, "আমাকে কেমন করে খুঁজে পেলে?"

ছোটাচ্চু টুনির হাত ধরে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে থেকেই বলল, "আমরা খুঁজে বের করেছি।"

সুমন বাইরে উঁকি দিয়ে ছোটাচ্চুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "বিজ্ঞান লেখক?"

ছোটাচ্চু বলল, "আসলে আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি।"

"ডিটেকটিভ? সত্যি?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। সত্যি।"

সুমনের মা সুমনের পাশে বসে তার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা চল বাসায় গিয়ে খাবি।" তারপর অন্য দুজনকে বললেন, "তোমরাও চল, আজ আমার বাসায় খাবে। সর্ষেবাটা দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধেছি। ইলিশ মাছ খাও তো?"

একজন বলল, "জি খাই। কিন্তু এখানে কী হচ্ছে? কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সুমনের বোন বলল, "বাসায় চল, যেতে যেতে বলব। অনেক লম্বা স্টোরি। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। একেবারে উপন্যাসের মতো।"

সুমন দরজা দিয়ে বের হতেই টুনি তার দিকে একটা খাম এগিয়ে দিল, বলল, "সুমন ভাইয়া, এটা তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"কী আছে এখানে?"

"বাসায় গিয়ে দেখো।"

সুমন বাসায় গিয়ে দেখল খামের ভেতর চুয়ান্ন টাকা। কেন এখানে চুয়ান্ন টাকা, ছোট মেয়েটা কে, কেন এই ছোট মেয়েটা তার হাতে চুয়ান্ন টাকা ধরিয়ে দিল সে কিছুই বুঝতে পারল না! বোঝার কথাও না।



টুনি ছোটাচ্চুর কাছে এসেছিল তার কলমের মতো ভিডিও ক্যামেরাটা দেখতে, ঠিক তখন ফারিহা আপু এসে হাজির। সে একা নয় তার সাথে আরেকজন মেয়ে। কিছু কিছু মানুষের চেহারার মাঝে দুঃখ দুঃখ ভাবের একটা পাকাপাকি ছাপ থাকে, এই মেয়েটা সেরকম। টুনিকে দেখে ফারিহা বলল, "আরে। আমাদের ইয়াং ডিটেকটিভ! কী খবর তোমার?"

টুনি বলল, "ভালো। তুমি ভালো আছ ফারিহাপু?"

"ভালো থাকা কি সোজা ব্যাপার নাকি? জান দিয়ে চেষ্টা করছি ভালো থাকার।"

ফারিহাকে দেখলেই ছোটাচ্চুর মন মেজাজ ভালো হয়ে যায়, তাই ছোটাচ্চু লাফ দিয়ে তার বিছানা থেকে নেমে চেয়ারের ওপর থেকে তার বইপত্র নামিয়ে খালি করে দিয়ে বলল, "এসো এসো। বস।"

ফারিহা বলল, "শাহরিয়ার, তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।" পাকাপাকিভাবে মন খারাপ করা চেহারার মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে তনু। আমার বান্ধবী। একটা জটিল সমস্যায় পড়েছে সে জন্যে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তুমি তোমার আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সি থেকে সাহায্য করতে পার কি-না দেখ।"

ছোট চাচ্চুর চেহারার মাঝে একটা খাঁটি ডিটেকটিভ ডিটেকটিভ ভাব চলে এল। গম্ভীর গলায় বলল, "অবশ্যই দেখব। কী সমস্যা শুনি।"

সমস্যাটা কী শোনার জন্যে টুনির খুবই কৌতূহল হচ্ছিল, শুধু ফারিহাপু আর ছোটাচ্চু থাকলে সে বসে বসে শুনতো, তাকে কেউ ঠেলেও সরাতে পারত না। কিন্তু এখন ফারিহার সাথে আরেকজন এসেছে তার নিজের সমস্যা নিয়ে, এখানে তার বসে থাকাটা মনে হয় ঠিক হবে না।

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু তোমরা কথা বল, আমি যাই। আমি এসেছিলাম তোমার কলমের মতো ভিডিও ক্যামেরাটা একটু দেখতে।"

ছোটাচ্চু মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল, "এটা কিন্তু ছোট বাচ্চাদের খেলনা না। এটা সত্যিকারের একটা টুল।"

"সেজন্যেই দেখতে চাচ্ছিলাম ছোটাচ্চু।" টুনি ইচ্ছে করলেই বলতে পারত এই ভিডিও ক্যামেরাটা যখন বানর চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তখন সে এটা উদ্ধার করে দিয়েছিল। তবে টুনি কিছু বলল না। বাইরের একটা মেয়ের সামনে এটা বলা মনে হয় ঠিক হবে না।

ছোটাচ্চু মুখ সূঁচালো করে জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে চাস?"

টুনি বলল, "ভিডিও ক্যামেরাটা কেমন করে কাজ করে একটু দেখব।"

অন্য সময় হলে ছোটাচ্চু কলমের মতো ভিডিও ক্যামেরাটা তাকে দিত কি না সন্দেহ আছে, কিন্তু ফারিহা আপু আর মন খারাপ চেহারার মেয়েটার সামনে না করতে পারল না। ড্রয়ার থেকে একটা ছোট বাক্স বের করে টুনির হাতে দিয়ে বলল, "এই যে, নে। দেখিস আবার হাত থেকে ফেলে দিয়ে নষ্ট করিস না।"

"তুমি চিন্তা করো না ছোটাচ্চু। আমার হাতে কখনো কোনো কিছু নষ্ট হয় না। শুধু দেখিয়ে দাও, কেমন করে অন অফ করে।"

ছোটাচ্চু বাক্সটা খুলে ভিডিও ক্যামেরাটা বের করে কেমন করে অন অফ করতে হয় দেখিয়ে দিল, টুনি তখন সেটা অন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ছোটাচ্চু ফারিহা আর তনুকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল বলে বুঝতে পারল না, টুনি বের হবার সময় সেটা জানালার উপর রেখে গেছে। ফারিহা আপুর বন্ধু মেয়েটি কী নিয়ে কথা বলে সেটা শোনার এটা একটা অসাধারণ সুযোগ।

ঘণ্টাখানেক পর ফারিহা তার বন্ধু তনুকে নিয়ে চলে যাবার পর টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে হাজির হল। ছোটাচ্চু তার ছোট নোট বইয়ে খুব গম্ভীর হয়ে কিছু একটা লিখছিল, টুনি সাবধানে তাকে ডাকল, "ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু তার নোট বই থেকে মুখ না তুলে বলল, "উঁ।"

"ফারিহা আপু আর তার বন্ধু তোমাকে কী বলেছে?"

কোনো একটা কারণে ছোটাচ্চুর মেজাজটা ভালো ছিল তাই ধমক না দিয়ে বলল, "তুই শুনে কী করবি?"

"মনে নাই, আমি তোমার এসিস্টেন্ট?"

"তোর ধারণা তুই আমার এসিস্টেন্ট। আসলে এটা বড়দের একটা প্রফেশনাল অর্গানাইজেশান—"

টুনি বলল, "ঠিক আছে। আমি ফারিহা আপুকে জিজ্ঞেস করব। ফারিহা আপু আমাকে বলবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ফারিহাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। কয়টা দিন যাক, আমিই তোকে বলব। তুই এবারে দেখিস আমি কতো কায়দা করে কেসটা সলভ করব।" ছোটাচ্চু কথা শেষ করে বুকে একটা থাবা দিল।

ছোটাচ্চু তখন আবার তার নোট বইয়ের উপর ঝুকে পড়ল আর টুনি ঘর থেকে বের হবার সময় জানালা থেকে কলমের মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরাটা হাতে করে নিয়ে এল।

ক্যামেরাটা তখনো চলছে, টুনি সুইচ টিপে সেটাকে বন্ধ করে নিল। এখন ক্যামেরাটাতে কী রেকর্ড হয়েছে সেটা দেখা দরকার। কীভাবে দেখতে হয় সে এখনো জানে না। ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করা যায় কিন্তু সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ছোটাচ্চুর মেজাজ ভালো থাকলে তার ল্যাপটপে দেখিয়ে দিতে পারে কিন্তু যখন দেখবে টুনি গোপনে তার ঘরে ফারিহা আপু আর তার বন্ধুর সব কথা ভিডিও করে ফেলেছে তখন সে বিপদে পড়ে যাবে।

টুনি কোনো ঝুঁকি নিল না, সে শান্তকে খুঁজে বের করল, তাকে জিজ্ঞেস করল, "শান্ত ভাইয়া, তুমি আমার একটা কাজ করে দিবে?"

অন্য যে কেউ হলে জিজ্ঞেস করতো, "কী কাজ?" শান্ত সেটা জানতে চাইল না, জিজ্ঞেস করল, "কতো দিবি?"

"দশ টাকা।"

শান্ত বলল, "আমি এতো কম টাকার কাজ করি না।"

"কী কাজ সেটা শুনবে না?"

"কী কাজ!"

টুনি তার হাতে ধরে রাখা কলমের মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরাটা শান্তর হাতে দিয়ে বলল, "এইটার মাঝে যে ভিডিওটা আছে, সেটা কম্পিউটারে কেমন করে দেখতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে?"

"কী আছে ভিডিওর মাঝে?"

"তাও জানি না। মনে হয় ছোটাচ্চুর কথা।"

"ছোটাচ্চুর ভ্যাদর ভ্যাদর?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "মনে হয়।"

শান্ত বলল, "ছোটাচ্চুর ভ্যাদর ভ্যাদর ভিডিও ক্যামেরা থেকে শুনতে হবে কেন? ছোটাচ্চুর সামনে গেলেই তো অরিজিনাল ভ্যাদর ভ্যাদর শুনতে পারবি।"

টুনি বলল, "বললাম তো আমি ছোটাচ্চুর ভ্যাদর ভ্যাদর শুনতে চাই না—এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা শিখতে চাই।"

শান্ত মুখ শক্ত করে বলল, "জ্ঞান অর্জন এতো সোজা না। জ্ঞান দেওয়া আরো কঠিন। দশ টাকায় হবে না। বেশি লাগবে।"

"ভিডিও ক্যামেরা কেমন করে চালায় সেটা জান?"

"একশবার।"

টুনি শান্তকে ভালো করে চিনে তাই মুখটা আরো শক্ত করে বলল, "ঠিক আছে আমি তাহলে প্রমি আপুর কাছে যাব। প্রমি আপু তোমার মতো এতো টাকা টাকা করে না।"

প্রমি বাচ্চা কাচ্চাদের ভেতর বড়, শান্তশিষ্ট এবং ঠাণ্ডা মেজাজের। কাজেই শান্ত তার নগদ দশ টাকার ঝুঁকি নিল না, বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে! এইবার করে দিচ্ছি, পরের বার এতো কম টাকায় কাজ হবে না, সেইটা মনে রাখিস।"

টুনি বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমাকেও টাকা ছাড়া কাজ করা শিখতে হবে।"

"আমি সব সময় টাকা ছাড়া কাজ করি। কোনোদিন শুনেছিস সকালে নাস্তা করার জন্যে আম্মুর কাছে টাকা চেয়েছি? স্কুলে যাবার জন্যে কোনোদিন আব্বু আম্মুর কাছে বিল করেছি? রাত্রে ঘুমানোর জন্যে কোনোদিন টাকা চেয়েছি? চাই নাই। চাওয়া উচিত ছিল।"

টুনি কোনো কথা বলল না, এই ভাবে যে চিন্তা করা যায় টুনি সেটাও কোনোদিন চিন্তা করেনি।

শান্ত তার ঘরে কম্পিউটারটা অন করে কলমের মতো দেখতে ভিডিও ক্যামেরাটার পিছন দিকটা খুলে একটা ইউ এস বি পোর্ট বের করে আনল। সেটা তার কম্পিউটারে লাগিয়ে ক্যামেরা থেকে ভিডিও ফাইলটা কপি করে সেটাতে ক্লিক করতেই ভিডিওটা শুরু হয়ে যায়। ভিডিওর ছবিটা অবশ্যি কাত হয়ে আছে, তাড়াহুড়ো করে রাখার সময় ক্যামেরাটা সোজা করে রাখা হয়নি। টুনি অবশ্যি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। শান্তকে বলল," এতো সোজা? তোমার সাথে দশ টাকার চুক্তি করা ঠিক হয় নাই। দুই টাকা দেয়া উচিত ছিল।"

শান্ত মুখ শক্ত করে বলল, "দশ টাকার এক পয়সা কম হবে না।"

টুনি ভিডিওটার দিকে তাকিয়ে ছিল, ছোটাচ্চু আর ফারিহা আপু এখনো ভদ্রতার কথা বলছে, আসল কথা শুরু করেনি। আসল কথা শুরু করলে কী বলবে তার পুরোটা শুনতে চায় তাই তাড়াতাড়ি তার পকেট থেকে একটা ময়লা দশ টাকার নোট বের করে শান্তর হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিল। শান্ত চলে যাবার পর টুনি, ছোটাচ্চু, ফারিহা আপু আর তার বন্ধুর

কথাগুলো শোনা শুরু করল। কথাগুলো বেশ স্পষ্ট, বুঝতে কোনো সমস্যা হল না। ভদ্রতার কথা শেষ হবার পর ফারিহা বলল, "শাহরিয়ার, তনুর সমস্যাটা খুবই আজব। তুমি কিছু করতে পারবে কি-না আমি জানি না।"

শহরিয়ার বলল, "আগেই হাল ছেড়ে দিও না। মনে নাই ষোল কোটি মানুষ থেকে একজনকে খুঁজে বের করেছি।" ভিডিওর ছবিতে ছোটাচ্চুর চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল না কিন্তু মনে হল সেখানে একটা অহংকারর ছাপ পড়ল।

ফারিহা বলল, "তনু, তুমিই বল।"

তনু নামের মেয়েটি, যার চেহারার মাঝে পাকাপাকি ভাবে একটা দুঃখের ছাপ—সেটা অবশ্যি ভিডিওটাতে এখন এতোটা বোঝা যাচ্ছে না, গলা পরিষ্কার করে বলল, "আমি ঠিক কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। সমস্যাটা আমার মা'কে নিয়ে। আমার মা সব সময়েই ছিলেন খুব সেনসিটিভ, অল্পতেই ভেঙে পড়েন। বাবা ছিলেন শক্ত টাইপের মানুষ। বাবা বছর খানেক আগে হঠাৎ করে মারা গেলেন।"

তনু একটু থামল, ছোটাচ্চু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আহা! আই এম রিয়েলি সরি।" টুনি ছোটাচ্চুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে না পারলেও টের পেলো সেখানে একটা দুঃখের ছাপ পড়েছে, ছোটাচ্চুর মনটা খুব নরম এরকম কিছু শুনলে ছোটাচ্চু সত্যি সত্যি মন খারাপ করে ফেলে। নরম গলায় বলল, "কতো বয়স ছিল তোমার বাবার?"

"বাহান্ন।"

"মাত্র বাহান্ন? আহা! কী হয়েছিল?"

"ডাক্তারেরা পরিষ্কার করে ধরতে পারিনি। ব্লাড ক্যান্সারের মতো আবার পুরোপুরি ব্লাড ক্যান্সার না। যাই হোক, বাবাকে বেশিদিন ভুগতে হয়নি, বাবা যখন বুঝতে পারলেন তখন সেই অসুস্থ অবস্থাতেই আমার মায়ের জন্যে সবকিছু গুছিয়ে দিলেন। ব্যাংক একাউন্ট, ফ্ল্যাটের কাগজপত্র পেনশনের নমিনি সবকিছু। এমন কী বেশিদিন হাসপাতালে থাকতেও রাজি হননি, শুধু শুধু টাকা নষ্ট হবে, তাই।"

"যাই হোক, বাবা মারা যাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের খুব মন খারাপ হল। আমাকে অবশ্যি খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে হল মায়ের জন্যে। মা একেবারে ভেঙে পড়লেন, ব্যাপারটা মানতেই পারেন না। বলা যেতে পারে মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে

দিলেন, সারারাত জেগে বসে থাকেন। তার ধারণা হতে থাকল আমার বাবার আত্মা তার সাথে যোগাযোগ করতে আসছেন। মা পরলোক নিয়ে চর্চা করতে লাগলেন। ঠিক তখন সর্বনাশটা হল।"

তনু চুপ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কী সর্বনাশ হল?"

"মা ইন্ট্রোভার্ট ধরনের মানুষ, বাইরে খুব যোগাযোগ নেই। সেই সাদাসিধে মা ফেস বুক একাউন্ট খুলে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, কারা মৃত মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আর ঠিক ঠিক মানুষজন পেতেও লাগলেন, তারা মাকে নানা ধরনের খবর দিতে লাগল। যে যেটা বলে মা সেটা বিশ্বাস করে বসে থাকেন। আর তখন একেবারে খাঁটি একটা ক্রিমিনাল এসে হাজির। এই দাড়ি, এই চুল, চোখ টকটকে লাল। কালো আলখাল্লা গলায় লাল শালুর চাদর। কীভাবে যে মায়ের খোঁজ পেয়েছে কে জানে, মা'কে বোঝাল সে বাবার আত্মাকে হাজির করে দেবে। মাও বিশ্বাস করে বসে থাকলেন। লোকটার চেহারা রাসপুতিনের মতো, কাজকর্মও সেইরকম। অনেক রকম ভড়ং চড়ং করে তারপর তার ওপর বাবার আত্মা এসে ভর করে, মায়ের সাথে কথা বলে প্রথম প্রথম শুধু পরকালের খবরাখবর এনে দিত। আজকাল বাবার আত্মা মা'কে উপদেশ দিতে শুরু করেছে। টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স এসব নিয়ে কথা বলছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ সর্বনাশ। আমাদেরকে না জানিয়ে মা মনে হয় এই লোককে টাকা পয়সাও দিয়েছে। কিন্তু সেইটা সর্বনাশ না। সর্বনাশ হচ্ছে এই লোক এখন মাঝে মাঝেই আমাদের বাসায় রাত কাটাতে শুরু করেছে। ঘরের মাঝে ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে কাপালিক সাধনা শুরু করেছে। মা'কে কিছুই বোঝানো যায় না—এই ক্রিমিনালের পা ধরে বসে থাকে।"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "তোমার মা'কে কী বলে এইভাবে বশ করেছে?"

তনু বলল, "লোকটা মহা ধুরন্ধর। মায়ের সাথে যোগাযোগ করার আগে একটু খোঁজ খবর নিয়ে এসেছে। বাবা কোথায় কাজ করতো, কোন হাসপাতালে ছিল, তার আত্মীয় স্বজন কারা এরকম। তারপর এই ফ্যাক্টগুলো সে ব্যবহার করে। আমাদের কথা খুব মন দিয়ে শোনে, সেখানে যেগুলো শোনে সেগুলো মনে রাখে, আগে পিছে কিছু একটা লাগিয়ে নিয়ে ব্যবহার

করে। লোকটার অসম্ভব বুদ্ধি মাঝে মাঝে রিস্ক নিয়ে কিছু একটা বলে যদি মিলে যায় তাহলে তো কথাই নাই—যদি টের পায় মিলছে না তখন কথাটা ঘুরিয়ে ফেলে।"

ফারিহা বলল, "কী সর্বনাশ!"

তনু বলল, "এখন আমাদের সেফটি নিয়ে দুশ্চিন্তা। কোনো এক রাতে আমাদের জবাই না করে চলে যায়। মা'কে বলাই যায় না, বাবা বাবা করে অজ্ঞান।"

ফারিহা বলল, "তুমি এখন শাহরিয়ারকে কী করতে চাও বল।"

"এই লোকটার খোঁজ খবর নিয়ে আমাদেরকে দেয়া। মা'কে বোঝাব—দরকার হলে পুলিশে খবর দেব।"

ছোটাচ্চু দুশ্চিন্তিত মুখে মাথা চুলকালো। বলল, "হুম।"

ফারিহা ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, "পারবে?"

ছোটাচ্চু চেষ্টা করল জোর দিয়ে বলতে, "অবশ্যই পারব।" কিন্তু গলায় খুব জোর পেল না। মাথা চুলকে বলল, "লোকটার ছবি আছে? নাম ঠিকানা।"

"ঠিকানা নাই, তার কারণ সে নাকি ঘর বাড়ি ঠিকানা বিশ্বাস করে না। নাম গাবড়া বাবা।"

"গাবড়া?"

"হ্যাঁ,গাবড়া, গাবড়া বাবা।"

"আর ছবি?"

তনু তার পকেট থেকে মোবাইল বের করে বলল, "আমি গোপনে ছবি তুলেছি। এই হচ্ছে সেই লোক—"

তনু তার মোবাইল টেলিফোনে লোকটার ছবি দেখাল আর সেই ছবি দেখে ছোটাচ্চু আর ফারিহা দুজনেই মনে হল ভয়ে আঁতকে উঠল।

এর পর আরো কিছু সময়ের ভিডিও আছে কিন্তু সেখানে কীভাবে কী করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা, টুনি সেটাও মন দিয়ে শুনল। যখন ভিডিওটা শেষ হল তখন সে কম্পিউটারটা বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে এল। শান্তর আম্মু রান্না ঘর থেকে বললেন, "কে? টুনি নাকি?"

"জি চাচী।"

"চলে যাচ্ছিস?"

'জি চাচী।"

"ফুচকা বানিয়েছি, খেয়ে যা।"

টুনি খুব সখ করে বেশ কয়েকটা ফুচকা খেলো।

চাচী জিজ্ঞেস করল, "কেমন হয়েছে?"

টুনি বলল, "অসাধারণ! একেবারে রাস্তার ফুচকার মতো!"

চাচী হেসে টুনির মাথায় একটা চাটি দিলেন, বললেন, "রাস্তার মতো?"

"জি চাচী। রাস্তার ফুচকা হচ্ছে বেস্ট! তুমি একটা টং ভাড়া করে আমাদের স্কুলের সামনে বসে যাও, দুইদিনে বড়লোক হয়ে যাবে।"

চাচী আবার টুনির মাথায় চাটি দিলেন।

একটু পর টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে উঁকি দিল। ছোটাচ্চু বিছানায় পা তুলে বসে আছে তার চোখে মুখে এক ধরনের উত্তেজনার ভাব, চোখগুলো জ্বল জ্বল করছে। টুনিকে দেখে চোখের জ্বল জ্বলে ভাবটা আরেকটু বেড়ে গেল, বলল, "টুনি? তুই।"

টুনি মাথা নাড়ল, "তোমার ভিডিও ক্যামেরাটা। ড্রয়ারে রেখে দেব?"

ছোটাচ্চু বললেন, "দে। রেখে দে।"

টুনি ড্রয়ারে ভিডিও ক্যামেরার বাক্সটা রেখে সাবধানে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বাক্সের ভিতরে ভিডিও ক্যামেরাটা নেই, ভিডিও ক্যামেরার মতো দেখতে একটা কলম আছে। ছোটাচ্চু বাক্সটা খুলে পরীক্ষা করলেও চট করে ধরতে পারত না কিন্তু টুনি কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না। যদি ধরা পড়ে যেতো তাহলে ভুল করে সত্যিকারের একটা কলম রাখার জন্যে অবাক হবার ভান করতো। ছোটাচ্চু সেটাও ধরতে পারত না। টুনি আরো কয়েকদিন ভিডিও ক্যামেরাটা ব্যবহার করে দেখতে চায়। আর স্কুলের একজন ম্যাডামের ধরার জন্যে কাজে লাগবে।

টুনি ছোটাচ্চুর বিছানার কাছে রাখা চেয়ারে বসে বলল, "ছোটাচ্চু।"

"বল।"

"ফারিহা আপুর বন্ধুর কেসটা বলবে?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "একজন ক্লায়েন্ট যখন আমার কাছে একটা কেস দেয়, সেটা আমার গোপন রাখতে হয়।"

"তুমি আমাকে বল, আমি গোপন রাখব।"

ছোটাচ্চু বলল, "বলা যাবে না।" টুনি ভাবল বলে ফেলে যে সবকিছু জানে, কিন্তু মনে হয় সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ছোটাচ্চুর মুখ থেকেই বের করতে হবে।

টুনি বলল, "ঠিক আছে তুমি যদি বলতে না চাও তাহলে আমি বিশটা প্রশ্ন করি। তুমি হ্যাঁ কিংবা না বলে তার উত্তর দাও। মনে নাই তুমি এই খেলাটা আমাদের শিখিয়েছ?"

যে খেলাটা ছোটাচ্চু নিজেই বাচ্চাদের শিখিয়েছে এখন সেটা খেলতে না চাওয়াটা কেমন দেখায়, তাই ছোটাচ্চু একটু গাই গুই করে রাজি হল, তবে বিশ প্রশ্নে নয়, দশ প্রশ্নে। টুনি যেহেতু সবকিছু জানে, এখন শুধু ছোটাচ্চুর মুখ থেকে সেটা বের করে আনার ভান করতে হবে, তাই সেও খানিকক্ষণ গাই গুই করে রাজি হয়ে গেল। টুনি গভীর ভাবে চিন্তা করার ভান করে প্রথম প্রশ্নটা করল, "যে সমস্যাটা নিয়ে এসেছে সেটা কি ফারিহা আপুর বন্ধু তনুর সমস্যা?"

ছোটাচ্চু মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"তাহলে কি তার মায়ের সমস্যা?"

"হ্যাঁ।"

টুনি গভীর ভাবে চিন্তা করার ভান করতে লাগল, জোরে জোরে চিন্তা করার ভঙ্গি করে বলল, "তার মায়ের সমস্যা কিন্তু তার বাবার কাছে না গিয়ে তোমার কাছে এসেছে, তার মানে তার বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই।"

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে বলল, "এটা কি তোর তিন নম্বর প্রশ্ন?"

"না।" টুনি বলল, "তুমি মাত্র দশটা প্রশ্ন দিয়েছ তাই আমাকে খুব সাবধানে সেগুলো করতে হবে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, "বাবা মারা যাবার কারণে কি মায়ের এই সমস্যা শুরু হয়েছে?"

প্রশ্ন শুনে ছোটাচ্চু কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল, "হ্যাঁ।"

টুনি চোখে মুখে আনন্দের একটা ভঙ্গি করল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "এটা কি আত্মীয়দের সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করা?"

ছোটাচ্চু বলল, "না।"

টুনি একটা প্রশ্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে হতাশার মতো একটা শব্দ করল। ছোটাচ্চু বলল, "তোর চারটা প্রশ্ন হয়েছে আর ছয়টা বাকি আছে।"

টুনি গভীর চিন্তায় ডুবে যাবার একটা অসাধারণ অভিনয় করল তারপর বলল, "তাহলে এটা কি বাবা মারা যাওয়ার পর তার আত্মা ফিরে এসে মা'কে ভয় দেখানোর ব্যাপার?"

ছোটাচ্চু আবার কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল, খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে, মানে ইয়ে, অ্যাঁ, অ্যাঁ মানে, হচ্ছে গিয়ে ঠিক উত্তরটা হ্যাঁ কিংবা না কোনোটাই না—তাহলে—"

টুনি আবার আনন্দের শব্দ করল, বলল, "তুমি এই প্রশ্নের উত্তর দাওনি কাজেই আমার এখনো ছয়টা প্রশ্ন আছে।"

ছোটাচ্চু কী করবে বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাতে লাগল। টুনি উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হবার ভঙ্গি করে ঘর পায়চারী করতে লাগল, তারপর বিড় বিড় করে বলল, "তুমি প্রশ্নটার উত্তর না দিলেও আসলে এখান থেকে আমি সবকিছু বুঝে গেছি!"

"কী বুঝে গেছিস?"

"তুমি আমার বাকি ছয়টা প্রশ্নের উত্তর দাও তারপর বলছি।"

"পাঁচটা।"

"ছয়টা।"

ছোটাচ্চু বলল, "উঁহু, তুই যদি আমার উত্তর থেকে কিছু একটা উত্তর পেয়ে যাস তাহলে সেই প্রশ্ন করা হয়ে গেছে।"

টুনি বলল, "কিন্তু তোমার উত্তর হ্যাঁ কিংবা না হওয়ায় কথা। তুমি কোনোটাই বলনি।"

"সব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ আর না দিয়ে দেওয়া যায় না। আমি যদি জিজ্ঞেস করি তুই কি প্রত্যেকদিন তেলাপোকা ভাজা করে খাস, তাহলে কি তুই হ্যাঁ কিংবা না বলে উত্তর দিতে পারবি?"

টুনি হাল ছেড়ে দেওয়ার ভান করে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। পাঁচ প্রশ্নই থাকুক। এখন আমি বুঝে গেছি ফারিহা আপুর বন্ধুর মায়ের সাথে তার বাবার আত্মা আসা নিয়ে একটা ব্যাপার হয়েছে। যদি সেটা ভয়ের ব্যাপার হতো তাহলে তোমার কাছে আসতো না—যেহেতু তোমার কাছে এসেছে তার মানে কোনো একজন ক্রিমিনাল এটা ঘটাচ্ছে। ঠিক কি না?"

"এটা কি একটা প্রশ্ন?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন। কোনো একজন মানুষ কি তনুর বাবার আত্মার কথা বলে তার মা'কে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে?"

ছোটাচ্চু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ।"

টুনি হাতে কিল দিয়ে বলল, "মানুষটা কি ভণ্ড পীর?"

"না—মানে—ঠিক ভণ্ড পীর না—"

"তাহলে কি কাপালিক? তান্ত্রিক, লম্বা চুল দাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"মানুষটা কি ফারিহা আপুর বাসায় উঠে এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

টুনি গম্ভীর গলায় বলল, "আমার এখনো একটা প্রশ্ন বাকি আছে কিন্তু এর মাঝে সবকিছু বের হয়ে গেছে! ছোটাচ্চু এখন তুমি বল আসলে কী হয়েছে।"

ছোটাচ্চু কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, মাথা চুলকে বলল, "তুই কেমন করে দশ প্রশ্নে এটা বের করে ফেললি?"

"নয় প্রশ্নে।"

"হ্যাঁ, নয় প্রশ্নে। তুই আসলেই খুবই বুদ্ধিমান। তোর লেখাপড়া কেমন হয়? পরীক্ষায় ফার্স্ট হোস?"

"না ছোটাচ্চু। ফার্স্ট সেকেন্ড উঠে গেছে, এখন শুধু এ, এ প্লাস এই সব। বেশি পড়তে হয় না।"

"ভেরি ইন্টারেস্টিং। অসাধারণ।"

"থ্যাংকু। তাহলে এখন আমাকে বল কী হয়েছে।"

"তোকে আর কী বলব- তুইতো জেনেই গেছিস।"

"তবু তোমার মুখ থেকে শুনি।"

একটু আগে ভিডিওটাতে যা যা শুনে এসেছে ছোটাচ্চু সেগুলো আবার বলল, টুনি গম্ভীর মুখে সবকিছু শোনার ভান করল। গাবড়া বাবা নামটা শুনে খুব অবাক হবার অভিনয় করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করবে ঠিক করেছ?"

ছোটাচ্চুর চোখ চক চক করে উঠল, বলল, "হ্যাঁ, একটা প্ল্যান করেছি।"

"কী প্ল্যান ছোটাচ্চু?"

"প্রথমে ভেবেছিলাম এই গাবড়া বাবাকে ফলো করে দেখব লোকটা আসলে কী করে, কোথায় থাকে। তখন মনে হল—" ছোটাচ্চু কথা থামিয়ে একটু হাসি হাসি মুখ করে বলল, "তার চেয়ে অনেক ভালো হবে স্টিং অপারেশান!"

"আগের মতন?"

"হ্যাঁ। গাবড়া বাবাকে ফাঁদে ফেলব।"

"কীভাবে ফাঁদে ফেলবে?"

"গাবড়া বাবা মহা ধুরন্ধর। তার এই ধুরন্ধর বুদ্ধি দিয়েই তাকে ধরা হবে।" ছোটাচ্চু দুলে দুলে হাসতে থাকে।

"কীভাবে?"

"তনুর বাবার যে কোনোকিছু যদি সে শুনে তাহলে সেটাই সে আত্মা সেজে এসে ব্যবহার করে। কাজেই তনুর বাবাকে নিয়ে ভুল একটা তথ্য দেয়া হবে, সেটা যখন ব্যবহার করবে তখন ধরা পড়ে যাবে।"

"ভুল কী বলবে ছোটাচ্চু? কীভাবে তাকে জানাবে।"

"মারাত্মক রকম ভুল কোনো তথ্য। যেমন আমি চিন্তা করছি এরকম।"

ছোটাচ্চু মুখটা সূঁচালো করে বলল, "যখন তনুর মা বাসায় নেই কিন্তু গাবড়া বাবা আছে তখন একজন মহিলা গিয়ে তাদের বাসায় হাজির হবে। গিয়ে সে দাবী করবে সে তনুর বাবার আগের পক্ষের স্ত্রী। স্ত্রী যদি পাওয়া না যায় তাহলে একটা ছেলে বা মেয়েও যেতে পারে, গিয়ে বলবে সে আগের পক্ষের ছেলে না হয় মেয়ে। সে তখন তনুর বাবার সম্পত্তির অংশ চাইবে। গাবড়া বাবা তখন নিশ্চয়ই মনে করবে তনুর বাবার আগের একজন স্ত্রী আছে। সেটা সে যখন ভড়ং চড়ং করে বলবে তখন হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।"

টুনিকে স্বীকার করতেই হল বুদ্ধিটা খারাপ না। একটা মৃত আত্মা আর যেটা নিয়েই ভুল করুক আগের পক্ষের স্ত্রী আছে কি নেই, সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভুল করবে না। গাবড়া বাবার মুখ দিয়ে এটা বলাতে পারলেই সে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে। টুনি জিজ্ঞেস করল, "কে যাবে তনুদের বাসায়?"

"প্রথমে ভেবেছিলাম আমি নিজেই যাব, গিয়ে বলব আমি আগের পক্ষের ছেলে। কিন্তু পরে মনে হল এটা ঠিক হবে না—হাজার হলেও আমি ডিটেকটিভ, আমার এই কাজটা করা ঠিক হবে না।"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, তোমার নিজের যাওয়া ঠিক হবে না। তোমার অভিনয় খুবই জঘন্য ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই কেমন করে জানিস আমার অভিনয় জঘন্য? তুই জানিস ইউনিভার্সিটিতে আমি মাতালের ভূমিকায় একটিং করেছি।"

"আমরা সেটা দেখি নাই কিন্তু বাসায় তুমি যখন কোনো একটা কিছু ভান করার চেষ্টা করো—আমরা সব সময় ধরে ফেলি।

"কখন ধরে ফেলিস?"

"এই মনে কর যখন ফারিহা আপু আসে তুমি ভান করো যেটা তোমার কাছে খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে খুশিতে তুমি ডগমগ করতে থাক।"

"বাজে কথা বলবি না। দেব একটা থাবড়া।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলব না। তুমি এখন বল, কাকে পাঠাবে।"

"আমার এক বন্ধু আছে নাটক থিয়েটারে একটিং করে। অসাধারণ একটিং, দেখলে বেকুব হয়ে যাবি। ভাবছি তাকে রাজি করাব।"

"রাজি হবে?"

"আমি বললে রাজি হবে কি না জানি না, ফারিহা বললে রাজি হবে।"

"ফারিহা আপু বলবে?"

"একশবার বলবে। ফারিহাকে কোনোদিন দেখেছিস এইরকম কাজ না করেছে?"

টুনি মাথা নাড়ল, আসলেই ফারিহা আপু কখনো এরকম কাজে না করে না। ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ কিছু একটা চিন্তা করল, তারপর বলল, "কালকে ভাবছি ঐ বাসা থেকে ঘুরে আসি। সরেজমিনে দেখে আসি। গাবড়া বাবাকেও দেখে আসি। স্টিং অপারেশান শুরু করার আগে মানুষটা দেখা দরকার।"

টুনি মুখ কাচুমাচু করে বলল, "ছোটাচ্চু।"

"কী হল।"

"তুমি আমাকে সাথে নিয়ে যাবে।"

"তোকে কোথায় সাথে নিয়ে যাব?"

"গাবড়া বাবার কাছে।"

"তোকে? গাবড়া বাবার কাছে? কেন?"

টুনি একেবারে হাত জোড় করে বলল, "প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!"

"তুই বাচ্চা মানুষ বড়দের কাজকর্মের মাঝে কেন থাকবি?"

"থাকব না ছোটাচ্চু। শুধু দেখব। প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তুমি যা চাইবে তাই দেব ছোটাচ্চু।"

ছোটাচ্চু মুখ ভেংচে বলল, "তোর আছে কী যে আমাকে দিবি?"

"যা আছে তাই দেব। মনে নাই আমি তোমার ডিটেকটিভ এজেন্সির কতো কাজ করে দিয়েছি!"

"তোকে কাজ করতে বলেছে কে? তোর এই কাজকর্মই তো যন্ত্রণা।"

"ঠিক আছে আমার কাজকর্ম যদি যন্ত্রণা হয়, তাহলে আমি আর তোমাকে জ্বালাব না।"

"সত্যি?"

"সত্যি। তুমি যদি চাও, তাহলে তোমার এসিস্টেন্ট হবার জন্যেও চাপাচাপি করব না।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "ঠিক আছে কাল তোকে নিয়ে যাব। সবাইকে বলা হবে তোর নাচের স্কুল থেকে তোকে নিয়ে বাসায় যাচ্ছি।"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"আর যতক্ষণ থাকবি একটা কথা বলবি না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"যা তাহলে, কাল বিকেলে রেডি থাকিস।"

টুনি বলল, "ছোটাচ্চু তোমার মুখটা একটু নামাবে?"

"কেন?"

"তুমি খুবই সুইট, তোমার গালে একটা চুমু দিই।"

"আমার গালে তোর চুমু দিতে হবে না, ভাগ এখান থেকে।"

টুনি চলে এলো, ছোটাচ্চু দেখতেও পেল না তার মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি। এরকম একটা হাসি দেখলে ছোটাচ্চু নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে যেতো।

পরদিন বিকাল বেলা টুনি ছোটাচ্চুর সাথে রওনা দিল, হাতে একটা মোটা বই। ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "কীসের বই এটা।"

"বিজ্ঞানের।"

"তুই কবে থেকে বিজ্ঞানের বই পড়া শুরু করেছিস?"

"আজকে থেকে।"

"ঢং করিস?"

"না ছোটাচ্চু। ঢং করব কেন? আমার কি বিজ্ঞানের বই পড়ার ইচ্ছা করতে পারে না?"

ছোটাচ্চু কোনো কথা বলল না, গজগজ করতে লাগল। ছোটাচ্চু কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবে না যে, টুনি ইচ্ছে করে একটা বিজ্ঞানের বই হাতে নিয়ে রওনা দিয়েছে যেন ছোটাচ্চু বইটা হাতে না নেয়।

তনুদের বাসার সামনে গিয়ে ছোটাচ্চু তনুকে ফোন করল। তনু তখন নিচে নেমে এসে ছোটাচ্চুকে উপরে নিয়ে গেল। ছোটাচ্চু নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, "তোমার আম্মু বাসায় আছেন?"



তনু বলল, "হ্যাঁ। আছে।"

"কী করছেন?"

"গাবড়া বাবার জন্যে রাঁধছেন। গাবড়া বাবার পাঙাস মাছ খাওয়ার সখ হয়েছে।"

"গাবড়া বাবা কী করছে?"

"ধ্যান করছে।"

"আজ রাতে কি থাকবে তোমাদের বাসায়?"

"মনে হয় থাকবে।"

দোতলার একটা ফ্ল্যাটে তনু তার মাকে নিয়ে থাকে। বসার ঘরেই ধূপের ঝাঁঝালো গন্ধ। পাশে একটা ঘরের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আসছে। তনু ফিস ফিস করে বলল, "এই ঘরে গাবড়া বাবা আছে।"

"আমরা কি দেখা করতে পারি?"

"দাঁড়াও, মা'কে বলে আসি। মা তার গাবড়া বাবাকে দেখে শুনে রাখে তো।"

"ঠিক আছে, যাও, আমরা এখানে বসি।"

ছোটাচ্চু আর টুনি সোফায় বসল, তনু তখন ভেতরে গেল তার মা'কে ডাকতে। কিছুক্ষণের মাঝেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে তনুর মা বের হয়ে এলেন, রান্না করছিলেন বলে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কপালের দুই পাশের চুল পাকতে শুরু করেছে। ছোটাচ্চুকে দেখে জ্বলজ্বলে চোখে বললেন, "তোমরা বুঝি গাবড়া বাবাকে দেখতে এসেছ?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, "জি। তনুর কাছে শুনেছি। আমার ভাতিজিকে নাচের স্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন মনে হল গাবড়া বাবাকে এক নজর দেখে যাই।"

"একেবারে সত্যিকারের সিদ্ধপুরুষ। আমাদের কতো বড় সৌভাগ্য এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

"বাবা ধ্যান করছিলেন। ধ্যানের সময় বাবাকে ডিস্টার্ব করা ঠিক না।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

"তোমাদের কারো সাথে যোগাযোগ করতে হবে?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"আগে মনে হতো জীবন আর মৃত্যু বুঝি একেবারে আলাদা। বাবার সাথে পরিচয় হবার পর বুঝেছি কোনো পার্থক্য নাই। যখন খুশি দেহান্তরিত মানুষের সাথে কথা বলা যায়। পরকালটা যেন পাশের একটা ঘর।"

ছোটাচ্চু বলল, "ও।"

"তনুর বাবা এখন নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ করে। গাবড়া বাবা না থাকলে যে কী হতো।"

ছোটাচ্চু আবার বলল, "ও।"

ঠিক এই সময় পাশের ঘর থেকে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল, আর তনুর মা তখন ছটফট করে উঠে বললেন, "বাবার ধ্যান ভেঙেছে। যাই আমি বাবার জন্যে দুধ নিয়ে আসি।"

তনুর মা প্রায় ছুটে গিয়ে একটু পরে বিশাল একটা মগে করে দুধ নিয়ে এলেন। ছোটাচ্চুকে বললেন, "এসো আমার সাথে। বাবার পা ধরে সালাম করো, তোমার জন্যে দোয়া করবেন।"

তারপর টুনির দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিও ভিতরে যাবে?"

টুনি ছোটাচ্চুকে কথা দিয়েছিল যে, সে একটা কথাও বলবে না। তাই সে কথা বলল না, মাথা নেড়ে তনু মা'কে জানাল সেও গাবড়া বাবার সাথে দেখা করতে চায়।

তনুর মা দরজা একটু ফাঁক করে বললেন, "বাবা, আপনার ধ্যান শেষ হয়েছে?"

গাবড়া বাবা সোজা হয়ে বসেছিল, চোখ খুলে বলল, "হাম্‌ম্‌ম্‌।"

হাম্‌ম্‌ম্‌ বলে কোনো শব্দ ছোটাচ্চু কিংবা টুনি কেউই শোনে নি। তনুর মা মনে হল এই শব্দের সাথে পরিচিত, দুধের মগ নিয়ে ভিতরে ঢুকে বলল, "বাবা, আপনি এখন একটু দুধ খান।"

গাবড়া বাবা বলল, "গাম্‌ম্‌ম্‌!"

এই শব্দটাও মনে হয় তনুর মা বুঝে গেলেন, তাড়াতাড়ি দুধের মগটা গাবড়া বাবার পায়ের কাছে রেখে বললেন, "এই দুইজন আপনার দোয়া নিতে এসেছে বাবা।"

গাবড়া বাবা মুখ তুলে এবারে ছোটাচ্চু আর টুনির দিকে তাকাল, তখন তারা তাকে প্রথমবার ভালো করে দেখতে পেল। মাথায় কুচকুচে কালো লম্বা

আর ঘন চুল। মুখে তার থেকেও কালো ঘন লম্বা দাড়ি। চুল দাড়ির জঙ্গলে গাবড়া বাবার চেহারাটাই ভালো করে দেখা যায় না। চাপা নাক আর ঘন ভুরু। চোখ দুটো টকটকে লাল। কপালে টকটকে লাল সিঁদুর। কালো একটা আলখাল্লা পরে আছে। সামনে একটা মাটির মালশা সেখানে এক খাবলা ধূপ দিতেই কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হয়ে এলো।

তনুর মা ফিস ফিস করে বললেন, "বাবাকে সালাম করো।"

ছোটাচ্চুর সালাম করার কোনো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু তনুর মাকে খুশি করার জন্যে এগিয়ে গিয়ে গাবড়া বাবার পা ছুঁয়ে সালাম করল। টুনির হাতে বিজ্ঞানের মোটা বই, সেটা ঘরের কোনায় শেলফে রেখে নিচু হয়ে গাবড়া বাবাকে সালাম করার ভঙ্গি করল। গাবড়া বাবা হুংকার দিয়ে বলল, "হাম্ম্ম্।"

মনে হল তনুর মা এই কথাটাও বুঝে ফেললেন। বুঝে ঝলমলে একটা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তোমাদের আর কোনো চিন্তা নাই, গাবড়া বাবা তোমাদের জন্যে দোয়া করে দিয়েছেন।"

ঘরের ভেতর ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাই ছোটাচ্চু আর বেশিক্ষণ থাকার চেষ্টা করল না, টুনির হাত ধরে বের হয়ে এল। বাসার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর টুনি বলল, "ছোটাচ্চু, আমার বিজ্ঞানের বইটা আমি গাবড়া বাবার রুমে ফেলে এসেছি।"

ছোটাচ্চু বলল, "এখন বলছিস? আগে বললি না কেন?"

"আগে মনে ছিল না।"

"এখন আমি তোর বইয়ের জন্যে ফিরে যেতে পারব না।"

টুনি বলল, "এখন যেতে হবে না, কিন্তু পরের বার তুমি যখন তনু আপুর বাসায় যাবে তখন নিয়ে এসো।"

"মনে থাকলে–"

"আমি মনে করিয়ে দেব। বইটা স্পেশাল।"

"বিজ্ঞানের একটা বই আবার স্পেশাল হয় কেমন করে? গল্প উপন্যাস হলে তবু একটা কথা ছিল।"

ছোটাচ্চুর বিজ্ঞান নিয়ে একটা এলার্জির মতো আছে, টুনি সেটা খুব ভালো করে জানে। বইটা এখন ফিরিয়ে আনা খুবই জরুরি। টুনি হালকা একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে তার মাথা চুলকাতে থাকে।

পরের দিন গাবড়া বাবাকে নিয়ে স্টিং অপারেশান শুরু করার কথা। ফারিহা ছোটাচ্চুর কথামতো নাটকদলের সেই ছেলেটাকে রাজি করিয়েছে। বিকেলবেলা তনুর মা গাবড়া বাবার জন্যে বাজার করতে কাঁচা বাজারে যাবেন, ঠিক তখন এই ছেলেটা তনুদের বাসায় যাবে। গাবড়া বাবার তখন ধ্যান করার কথা, বাসা নীরব থাকে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বললে গাবড়া বাবা শুনতে পাবে। টুনির পুরো ঘটনাটা দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। যখন গাবড়া বাবার জন্যে এই নাটকটা হবে তখন সেখানে তনু ছাড়া আর কেউ থাকবে না। ছোটাচ্চু আর ফারিহা পর্যন্ত বাইরে একটা চায়ের দোকানে অপেক্ষা করবে।

নাটকের ছেলেটাকে নিয়ে ছোটাচ্চু আর ফারিহা বাইরে অপেক্ষা করছিল, যখন দেখল তনুর মা হাতে একটা ছাতা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেলেন তখন নাটকের ছেলেটা ভেতরে ঢুকলো। আগে থেকে ঠিক করা ছিল, বেশ কয়েকবার কলিংবেল টেপার পর তনু দরজা খুলল, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটা তার নাটকের গলায় জিজ্ঞেস করল, "এইটা কি আনোয়ার সাহেবের বাসা?"

তনুর বাবার নাম আনোয়ার হোসেন। তনু বলল, "জি।"

"আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

"আসেন।"

নাটকের ছেলেটা ভিতরে ঢুকলো, বসার ঘরে একটু হাঁটল। গাবড়া বাবার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ভেতরে ধোঁয়া কেন?"

তনু বলল, "সেটা অন্য ব্যাপার। আপনি কার কাছে এসেছেন?"

নাটকের ছেলেটা হা হা করে হাসল, বলল, "কী আশ্চর্য! আমি আমার নিজের বাসায় আসতে পারব না?"

তনু অভিনয় করে না, তবু আশ্চর্য হবার অভিনয় করে বলল, "নিজের বাসা?"

গাবড়া বাবার ঘরের ভেতর হালকা শব্দ হচ্ছিল, হঠাৎ করে ঘরটা নিঃশব্দ হয়ে গেল। বাইরের ঘরে কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে গাবড়া বাবা নিশ্চয়ই শোনার চেষ্টা করছে।

নাটকের ছেলেটা স্টেজের এক মাথা থেকে হলঘরের অন্য মাথায় পৌঁছে দেবার মতো তেজি গলার স্বরে বলল, "হ্যাঁ। এইটা আপনার যেরকম বাসা, আমারও সেইরকম বাসা। আনোয়ার হোসেন আমার বাবা।"

তনু অতি অভিনয় করে বলল, "বাবা?"

"হ্যাঁ। আমার মা হচ্ছেন আপনার বাবার প্রথম স্ত্রী। আমি তার প্রথম স্ত্রীর ছেলে। তার মানে আপনি আমার ছোট বোন। ছোট বোনকে আপনি করে বলতে হবে কেন? আমি তুমি করে বলব। তুমি আমার ছোট বোন। তুমি তুমি তুমি।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

নাটকের ছেলেটা অপূর্ব অভিনয় করে বলল, "তোমরা আমাদের দুঃখ কোনোদিন বুঝবে না। আমার মা খুব সাধারণ একটা মেয়ে ছিল। আমার জন্মের পর তোমার বাবা আমার মা'কে ছেড়ে এসে তোমার মা'কে বিয়ে করেছে। আমার মা কতো কষ্ট করে আমাকে বড় করেছে তুমি জান?"

তনু বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

নাটকের ছেলেটা নাটকীয় ভঙ্গিতে হা হা করে হাসল, বলল, "আমি জানি তোমরা বিশ্বাস করবে না, সে জন্যে আমি সাথে করে প্রমাণ নিয়ে এসেছি।"

"কী প্রমাণ?"

"এই দেখ।"

তখন নাটকের ছেলেটা একটা খাম বের করে সেখান থেকে কয়েকটা ফটো বের করার ভান করল। গলা উঁচিয়ে বলল, "এই দেখ আমার মায়ের বিয়ের ছবি। তোমার বাবাকে চিনতে পারছ?"

"হ্যাঁ। আসলেইতো এটা আমার বাবা, কী আশ্চর্য!"

"পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা কি তোমার মা?"

তনু বলল, "না।"

"এটা আমার মা। কুলসুম বেগম।"

তনু বলল, "কুলসুম?"

ছেলেটা খাম থেকে আরো কিছু কাগজ বের করল, বলল, "এই দেখো আমার মা'কে লেখা বাবার চিঠি। হাতের লেখা চিনতে পারো? কার হাতের লেখা এটা?"

"আমার বাবার।"

"কী লিখেছে দেখেছ? কুলসুম, আমি দুঃখিত তোমার সাথে আমার আর সম্পর্ক রাখা সম্ভব না। রাজুকে দেখেশুনে রেখো—"

"রাজু কে?"

"আমি। আমার নাম রাজু।"

তনু বলল, "এই ফটো, চিঠিপত্রগুলো আমাকে দেবে?"

নাটকের ছেলেটা গমগমে গলায় বলল, "না। এগুলো এখন আমি তোমাকে দেব না। তোমরা যদি নিজেরা আমাকে গ্রহণ করে নাও ভালো, যদি কোর্টে যেতে হয় তাহলে এগুলো হবে আমার একমাত্র প্রমাণ।"

"তোমার মা কোথায়?"

নাটকের ছেলেটা গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মা গত বছর মারা গিয়েছেন। হয়তো পরকালে বাবা শেষ পর্যন্ত মা'কে গ্রহণ করেছেন। কে বলতে পারবে? কে উত্তর দেবে?"

"তুমি এখন কী চাও?"

"তোমার বাবার সন্তান হিসেবে আমি আমার অধিকার চাই।"

"কীভাবে?"

"তোমার সাথে যেভাবে কথা বলেছি, সেভাবে তোমার মায়ের সাথে কথা বলতে চাই।"

তনু মাথা নেড়ে বলল, "না, না। এখন আমার মা'কে এটা বলা যাবে না। আমার মা তাহলে একেবারে ভেঙে পড়বে।"

"আগে হোক পরে হোক এটা তোমার মাকে বলতেই হবে।"

তনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এই বিষয়টার কথা আর কে কে জানে?"

"মায়ের আত্মীয় স্বজনেরা জানতো, তারা কেউ বেঁচে নেই। মা বেঁচে নেই তাই আমি ছাড়া কেউ জানত না। এখন তুমি জানো।"

"আর কেউ?"

"না। আর কেউ জানে না। আমার বাবা জানতো, কিন্তু সে তো আর এটা বলার জন্যে ফিরে আসবে না।"

তনু কোনো কথা বলল না, নাটকের ছেলেটা যেরকম নাটকীয় ভাবে এসেছিল ঠিক সেরকম নাটকীয়ভাবে চলে গেল। তনু কিছুক্ষণ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, শুনতে পেলো গাবড়া বাবা দরজার কাছ থেকে সরে গেল। ধুরন্ধর মানুষটা সবকিছু শুনেছে। তনু একটু এগিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিল। ঘরের মাঝখানে গাবড়া বাবা পদ্মাসনে ধ্যান করার ভঙ্গিতে বসে আছে। দেখে মনে হবে কিছু শুনে না, কিছু জানে না।

টুনি ছোটাচ্চুকে এমনভাবে জ্বালাতন করল যে ছোটাচ্চু সেদিন তনুদের বাসা থেকে তার বিজ্ঞানের বইটা উদ্ধার করে নিয়ে এল। কৃতজ্ঞতা হিসেবে

টুনি ছোটাচ্চুর গালে একটা চুমু দিতে রাজি ছিল কিন্তু ছোটাচ্চু সেটা নিতে রাজি হল না। তবে তনুর বাসায় কী হয়েছে সেটা বেশ রংচং দিয়ে টুনিকে শুনিয়ে দিল। এখন শুধু অপেক্ষা করতে হবে কখন গাবড়া বাবার উপর তনুর বাবার আত্মা এসে ভর করে। সেটার জন্যে খুব বেশি দেরি হওয়ার কথা না।

সত্যি সত্যি একদিন পরেই ছোটাচ্চুকে তনু খবর দিল, গাবড়া বাবা জানিয়েছে তনুর বাবা তার পরিবারকে কিছু জরুরি খবর দিতে চায়। রাত্রিবেলা তনুর বাবা স্বপ্নে বলে গেছে। গাবড়া বাবা সেজন্যে বিকেলে মৃত আত্মাকে আহ্বান করতে চায়।

শুনে তনু খুবই কাচুমাচু হয়ে বলল, "ছোটাচ্চু—"

ছোটাচ্চু কথাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না, রীতিমতো হুংকার দিয়ে বলল, "নো। নেভার। তোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

"একবার। শুধু একবার। এই শেষ—"

ছোটাচ্চু আরো জোরে হুংকার দিল, "না। এর আগেরবার তুই বলেছিস আর কোনোদিন আমাকে জ্বালাতন করবি না।"

"আমি জ্বালাতন করব না ছোটাচ্চু। চুপ করে থাকব। এর আগেরবার কি একবারও কথা বলেছিলাম?"

ছোটাচ্চু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না। এটা বড়দের ব্যাপার। ভণ্ড কাপালিককে হাতে নাতে ধরা হবে। এখানে শুধু বড়রা থাকবে। ছোটদের জায়গা এটা না।"

টুনি তারপরেও চেষ্টা করল কিন্তু ছোটাচ্চু কিছুতেই রাজি হল না।

দুপুরের দিকে কিছু একটা খেয়ে ছোটাচ্চু বের হয়ে গেল। টুনি তখন শান্তকে খুঁজে বের করে বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমার সাথে কথা আছে।"

"কী কথা?"

"আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কতো টাকার কাজ?"

"এখনো জানি না, কম হলেও পাঁচশ টাকা তো হবেই।"

শান্তর চোয়াল ঝুলে পড়ল, বলল, "পাঁ-চ-শ-টা-কা?"

টুনি বলল, "বেশিও হতে পারে, সেটা নির্ভর করবে তোমার উপর। তবে—"

"তবে কী?"

"কোনো এডভান্স দিতে পারব না। কাজ শেষ হলে টাকা পাবে।"

শান্ত ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "ঠিক তো? পরে ফাঁকি দিবি না তো?"

টুনি মুখ শক্ত করে বলল, "কখনো দিয়েছি?"

শান্ত বলল, "ঠিক আছে কী করতে হবে বল।"

টুনি তার কাজটা ব্যাখ্যা করতে থাকে আর সাথে সাথে শান্তর মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠতে থাকে। এই হাসি দেখে যে কোনো স্বাভাবিক মানুষের ভয় পেয়ে যাবার কথা।

বিকেলবেলা গাবড়া বাবার ঘরে তনু, তনুর মা ছাড়াও ছোটাচ্চু আর ফারিহা বসে আছে। গাবড়া বাবার সামনে একটা মাটির মালশা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঘরের সব জানালার সব পর্দা টেনে রাখা হয়েছে, দরজাও বন্ধ তাই ঘরের মাঝে আবছা অন্ধকার। সামনে একটা মোমবাতি জ্বলছে। গাবড়া বাবার শরীরে কালো আলখাল্লা, একটা লাল চাদর গলা থেকে ঝুলছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গাবড়া বাবা হঠাৎ হুম-ম-ম-ম করে একটা শব্দ করল, সেই শব্দ শুনে ছোটাচ্চু রীতিমতো চমকে উঠল।

গাবড়া বাবা হঠাৎ তার লাল চোখ খুলে সবাইকে এক নজর দেখে নিল, তারপর বলল, "কেউ কথা বলবা না। তাহলে আত্মার কষ্ট হবে। আত্মা আসতে পারবে না। আবার আসলে যেতে পারবে না। মহাবিপদ হয়ে যাবে।"

সবাই এমনিতে চুপ করে বসেছিল, এখন আরো চুপ করে গেল, মনে হল শ্বাস প্রশ্বাসও নিতে লাগল নিঃশব্দে। গাবড়া বাবা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল তারপর হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে নানারকম বিচিত্র শব্দ করতে লাগল তারপর হঠাৎ কাঁপুনি থামিয়ে সোজা হয়ে বসে নাকি সুরে বলল, "নিলু। নিলু তুমি কই?"

নিলু নিশ্চয়ই তনুর মায়ের নাম, একেবারে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে বললেন, "এই যে, এই যে আমি।"

"আমি আনোয়ার।"

তনুর মা বললেন, "জানি। আমি জানি।"

"আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে নীলু। অনেক কষ্ট।"

"কেন? কষ্ট কেন?" তনুর মা একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

"পৃথিবীর মায়া আমাকে বড় কষ্ট দেয়। তোমার কথা তনুর কথা আমি ভুলতে পারি না। তাই বারবার তোমাদের কাছে আসি।"

ছোটাচ্চু গাবড়া বাবার ফিচলে কথা শুনে মুগ্ধ হল। লোকটা যত বড় ক্রিমিনালই হোক কথা বলে গুছিয়ে।

তনুর মা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন, "তোমার কথাও আমরা ভুলতে পারি না। গাবড়া বাবা আছে বলে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। মনটা শান্ত হয়।"

গাবড়া বাবা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "নীলু। তোমার মনটা শক্ত কর। এখন তোমাকে আমি একটা কথা বলব।"

"কী কথা।"

"আমার সাথে কুলসুমের দেখা হয়েছে।"

ছোটাচ্চু আবছা অন্ধকারে মুচকি হাসল। গাবড়া বাবা ফাঁদে পা দিচ্ছে। স্টিং অপারেশান শুরু হয়ে গেছে।

তনুর মা অবাক হয়ে বললেন, "কুলসুম? কুলসুম কে?"

"তুমি কুলসুমকে চিন না। তার কারণ আমি তোমাকে কোনোদিন কুলসুমের কথা বলি নাই। কুলসুম আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।"

তনুর মা চমকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, বললেন, "তোমার আগের পক্ষের স্ত্রী আছে?"

গাবড়া বাবা নাকি সুরে বলল, "হ্যাঁ নিলু। তোমাকে আগে কখনো বলি নাই, আজকে বলি। তোমাকে বিয়ে করার আগে আমি আরেকটা বিয়ে করেছিলাম, তার ঘরে আমার একটা ছেলেও আছে। ছেলেটার নাম রাজু।"

"ছেলে? রাজু?"

"হ্যাঁ। তারা তোমার কাছে আসবে।"

"আসবে?"

"হ্যাঁ। সম্পত্তির জন্যে মামলা করবে সাবধান।"

কথা শেষ করে গাবড়া বাবা হঠাৎ আবার থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, তারপর ধড়াম করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

ঘরের সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে তারপর তনুর মা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, "কী আশ্চর্য!"

গাবড়া বাবা তখন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, "কে? কী?"

কেউ কোনো কথা বলল না। গাবড়া বাবা বলল, "এসেছিল? তোমার স্বামী এসেছিল? ভর করেছিল আমার উপর?"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না। গাবড়া বাবা বলল, "কী হল? তোমরা সবাই চুপ করে আছ কেন?"

এবারে ছোটাচ্চু বলল, "তার কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি আপনি একজন ভণ্ড।"

এবারে গাবড়া বাবা চমকে উঠল, বলল, "ভণ্ড?"

"হ্যাঁ, আপনি ভণ্ড এবং প্রতারক।"

গাবড়া বাবা আরো জোরে চমকে উঠল, "ভণ্ড এবং প্রতারক?"

"হ্যাঁ।"

"কেন এরকম বলছ? কী হয়েছে তোমার?"

"তার কারণ তনুর বাবা আনোয়ার হোসেনের আগের কোনো স্ত্রী নেই। আগের কোনো ছেলে নেই। আনোয়ার হোসেনের একজনই স্ত্রী আর একজনই মেয়ে।"

গাবড়া বাবা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, বলল, "কিন্তু কিন্তু কিন্তু—"

"এর মাঝে কোনো কিন্তু নেই। আমরা আগেই সন্দেহ করছিলাম আপনি ভণ্ড। আপনি ভান করেন যে, আপনার উপর আত্মা ভর করে, আপনার মুখ দিয়ে আত্মা কথা বলে। আসলে সব আপনার একটিং!"

এবারে তনুও মুখ খুলল। গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমার বাবা কখনো আগে আরেকটা বিয়ে করেনি!"

গাবড়া বাবা এবারে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, আমতা আমতা করে বলল, "না মানে ইয়ে, আসলে এটা তো আমি বলি নাই, আনোয়ার সাহেবের আত্মা বলেছে—"

তনু আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "মোটেও আমার বাবার আত্মা এসে এগুলো বলেনি! আমার বাবার আত্মা এসে ফালতু মিথ্যা কথা বলে বেড়াবে না।"

গাবড়া বাবা এবারে মোটামুটি ভয় পেয়ে গেল, মনে হল সে তার ঝোলাটার দিকে হাত বাড়াল, হাতে নিয়ে মনে হয় একটা দৌড় দেবে কিন্তু ঠিক সেই সময় তনুর মা তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বললেন, "তনু! তুই থামবি?"

তনু প্রায় কান্না কান্না গলায় বলল, "কেন মা? আমাকে কেন থামতে হবে? এই লোক আমাদের ঠকিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সাথে তামাশা করছে আর দিনের পর দিন আমাদের সেটা সহ্য করতে হবে?"

তনুর মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "গাবড়া বাবা মোটেও তামাশা করছেন না।"

তনু হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "মানে?"

"গাবড়া বাবার একটা কথা এখনো ভুল বের হয়নি। নিশ্চয়ই তোর বাবা গোপনে আরেকটা বিয়ে করেছিল। আমাকে কখনো বলে নাই। পরকালে সেটা নিয়ে অপরাধবোধে ভুগছে। এখন নিশ্চয়ই সেটা আমাদেরকে জানাতে চায়। আমাদেরকে বলে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হতে চায়। আমাদের এখন খোঁজ নিতে হবে। ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

তনু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বলছ তুমি মা? তুমি জান তোমার গাবড়া বাবা কেন এই কথা বলছে? তুমি জান?"

তনুর মা বলল, "আমার কোনো কিছু জানার দরকার নাই। শুধু তুই জেনে রাখ, আমার মেয়ে হয়ে তুই গাবড়া বাবাকে অসম্মান করতে পারবি না। তোকে এক্ষুনি গাবড়া বাবার পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।"

তনুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে গাবড়া বাবার মুখের দিকে তাকাল, তার চোখেমুখে তখন আনন্দের মৃদু হাসি, শুধুমাত্র বড় বড় দাড়ি-গোঁফের কারণে সেটা ঢাকা পড়ে আছে। তনুর মা আবার বললেন, "পা ধর গাবড়া বাবার। এক্ষুনি পা ধর বলছি।"

তনু পা ধরল না, তার চেহারাটা কেমন জানি ম্লান হয়ে গেল। তনুর মা চিৎকার করে বলল, "পা ধরে মাপ চা বলছি। তা না হলে তোকে আমি ত্যাজ্য কন্যা করে দেব। বাড়ি থেকে বের করে দেব—"

ঠিক তখন দরজায় বেল বাজল, কেউ একজন এসেছে। গাবড়া বাবা এই বাসায় জায়গা নেবার পর অন্য কেউ আজকাল খুব আসে না। বেল বাজার জন্যে অবশ্যি তনু উঠে যাবার সুযোগ পেল। দরজা খুলে দেখে সেখানে টুনি দাঁড়িয়ে আছে। তনু অবাক হয়ে বলল, "তুমি? তুমি কোথা থেকে?"

টুনি বলল, "এই তো এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মনে হল একবার আপনাদের দেখে আসি।"

তনু কিছু বলল না। টুনি বলল, "আপনাদের কী খবর?"

তনু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "খবর ভালো না।"

ভেতর থেকে তনুর মা বললেন, "তনু। ভেতরে আয় বলছি। গাবড়া বাবার সাথে বেয়াদপী করার জন্যে এক্ষুনি পা ধরে মাপ চা।"

টুনি কী একটা ভাবল, তারপর দরজা ঠেলে গাবড়া বাবার ঘরে ঢুকে গেল। ভেতরে আবছা অন্ধকার, ছোটাচ্চু তার মাঝেই টুনিকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "টুনি! তুই কী করছিস এখানে?"

টুনি বলল, "মনে নাই, আমার নাচের ক্লাস হয় এখানে।"

ছোটাচ্চু রেগে বলার চেষ্টা করল, "না-না-নাচ?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমার নাচের টিচারকে গাবড়া বাবার কথা বলেছি, তাই নাচের টিচার একটা জিনিস নেবার জন্যে আসতে চাচ্ছিলেন।" আমি বললাম, "আমিই নিয়ে আসব।"

ছোটাচ্চু ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "কী জিনিস?"

"গাবড়া বাবার একটা চুল।"

"চুল? চুল দিয়ে কী হবে?"

"তাবিজ।" টুনি চোখ বড় করে হাত নেড়ে বলল, "আমার নাচের টিচার বলেছেন, সিদ্ধ পুরুষের চুল দিয়ে তাবিজ বানানো যায়। ফাটাফাটি তাবিজ!"

তনুর মা জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের তাবিজ?"

"সবকিছুর তাবিজ। আমাদের নাচের টিচার তার ছেলের জন্যে বানাতে চাইছে।"

"ছেলের কী সমস্যা?"

"বিছানায় পিশাব করে দেয়।"

তনুর মা একটু থতমত খেয়ে বললেন, "ও!"

টুনি সবাইকে পাশ কাটিয়ে গাবড়া বাবার দিকে এগিয়ে যায়। গাবড়া বাবা কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে বলল, "দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি। আমার একটা চুল ছিঁড়ে দিচ্ছি।"

টুনি বলল, "আপনাকে দিতে হবে না। আপনি বসে থাকেন, আমি নিয়ে নেব। একটা চুল, খালি একটা।"

গাবড়া বাবা দুই হাতে নিজের চুল জাপটে ধরে বলল, "না, না।"

কিন্তু ততক্ষণে টুনি প্রায় ডাইভ দিয়ে গাবড়া বাবার চুল ধরে ফেলেছে। সে বলেছে তার একটা চুল দরকার কিন্তু দেখা গেল সে মোটেও একটা চুলের জন্যে চেষ্টা করছে না। খাবলা দিয়ে চুলের ঝুটি ধরে ফেলেছে। এতোগুলো চুল ছেঁড়া সম্ভব না কিন্তু তারপরও টুনি হ্যাঁচকা টান দিয়ে চুলের গোছা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। সবাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে

আছে এবং তার মাঝে হঠাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটি ঘটে গেল। টুনির হ্যাঁচকা টানে হঠাৎ করে গাবড়া বাবার মাথার পুরো চুল উপড়ে টুনির হাতে চলে এলো! অন্য সবাই বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেও টুনি মোটেই অবাক হল বলে মনে হল না। সে পুরো চুলগুলো ছোটাচ্চুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এবারে খাবলা দিয়ে গাবড়া বাবার দাড়ি ধরে হ্যাঁচকা টানের পর টান দিতে লাগল। কোনো একটা বিচিত্র কারণে এবারে সবাই বুঝে গেল চুলের মতো পুরো দাড়িগুলোও উপড়ে চলে আসবে। বড় ধরনের হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল, গাবড়া বাবা ঝটকা দিয়ে টুনিকে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু টুনি গাবড়া বাবার দাড়ি ছাড়ল না, সে টানতেই লাগল এবং হঠাৎ করে পুরো মিশমিশে কালো দাড়ি গাবড়া বাবার মুখ থেকে খুলে এলো। টুনি সেই দাড়িগুলো বিজয়ীর মতো ধরে রেখে বলল, "তাবিজ বানানোর জন্য আসল চুল দাড়ি দরকার। এই নকল চুল দাড়ি দিয়ে হবে না।"

টুনির কথা কেউ শুনল না, সবাই অবাক হয়ে গাবড়া বাবার দিকে তাকিয়ে রইল, এখন তাকে দেখাচ্ছে খুবই অদ্ভুত। মাথায় একটাও চুল নাই বিস্তৃত টাক, মুখে একটা দাড়িও নেই। থুতনিটা ছোট, মনে হয় তাকে তৈরি করার সময় মালমশলার অভাব হয়েছিল বলে থুতনিটা অসমাপ্ত রেখে শেষ করে দেয়া হয়েছে। পাতলা ঠোঁট আর তরমুজের বিচির মতো কালো কালো দাঁত বের হয়ে আছে। কুৎকুতে চোখ এবং দেখে মনে হয় কেউ একজন একটা খাটাসকে সিদ্ধ করে তার সবগুলো লোম খিমচে খিমচে তুলে নিয়েছে। মানুষটার দিকে তাকালে সবার আগে যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ডান গালে একটা কাটা দাগ, কানের নিচ থেকে শুরু করে থুতনি পর্যন্ত লোম এসেছে।

গাবড়া বাবা নামের মানুষটার কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে কী হচ্ছে, তারপর হাত দিয়ে তার লাল রঙের ঝোলাটা হাতে নিয়ে সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে একটা রিভলবার বের করে সবার দিকে তাক করে বলল, "খবরদার। খুন করে ফেলব।"

যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ অনুমান করেনি হঠাৎ করে ঘটনাটা এভাবে মোড় নেবে। লোমবিহীন খাটাসের মতো দেখতে গাবড়া বাবা নামের মানুষটা তার রিভলবারটা সবার দিকে তাক করে আস্তে

আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। লাথি দিয়ে দরজাটা খুলে হিংস্র গলায় বলল, "খবরদার! আমার পিছনে পিছনে আসলে খুন করে ফেলব।"

তনুর মা বললেন, "কেউ তোমার পিছন পিছন যাবে না। তুমি বিদায় হও।" তারপর মানুষটা শুনতে পায় না সেভাবে ফিস ফিস করে বললেন, "বদমাইস জোয়াচ্চুর কোথাকার!"

গাবড়া বাবা নামের মানুষটা দড়াম করে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। তারা শুনতে পেল সে বসার ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে যাচ্ছে।

ছোটাচ্চুর হাতে গাবড়া বাবার চুল, টুনির হাতে তার দাড়ি। ছোটাচ্চু চুলগুলো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে টুনিকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কেমন করে জানলি এর চুল দাড়ি নকল।"

"আমার বিজ্ঞানের বই।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বিজ্ঞানের বই?"

"হ্যাঁ, মনে নেই, আমার বিজ্ঞানের বইটা এই ঘরে ভুল করে রেখে গিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ। তাতে কী হয়েছে?"

"আসলে ভুল করে ফেলে যাই নাই, ইচ্ছা করে ফেলে গিয়েছিলাম। তার কারণ হচ্ছে আসলে ঐ বইটা খালি বিজ্ঞানের বই ছিল না, তোমার ভিডিও ক্যামেরাটা এর মাঝে ফিট করা ছিল।"

ছোটাচ্চুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল, "আমার ভিডিও ক্যামেরা?"

টুনি বলল, "হ্যাঁ। সারারাত এই ঘরের ভিডিও তুলেছে। সেই ভিডিওতে আমি দেখেছি গাবড়া বাবা রাত্রিবেলা চুল দাড়ি খুলে ঘ্যাস ঘ্যাস করে মাথার চাঁদি আর গাল চুলকায়।"

"আমাকে বলিসনি কেন?"

"ভয়ে।"

"কীসের ভয়?"

"তুমি যদি বকা দাও। মনে নাই আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম আর কোনোদিন তোমাকে জ্বালাব না!"

"তাই বলে এটা বলবি না? এখন দেখ লোকটা পালিয়ে গেল, আগে থেকে জানলে ধরে ফেলতে পারতাম।"

টুনি মুখ কাচুমাচু করে বলল, "একটা কথা বলব ছোটাচ্চু?"

"কী কথা?"

"তুমি বকা দিবে না তো?"

"না বকা দিব না। বল।"

"এই লোকটা আসলে পালিয়ে যেতে পারবে না।"

ছোটাচ্চু চোখ বড় বড় করে বলল, "পালিয়ে যেতে পারবে না? কেন?

"তোমার পারমিশান না নিয়েই তোমার নামে শান্ত ভাইয়ার সাথে পাঁচশ টাকার কন্ট্রাক্ট করেছি।"

"কী কন্ট্রাক্ট করেছিস?"

"শান্ত ভাইয়া তার বন্ধুদের নিয়ে নিচে অপেক্ষা করছে। তাকে বলেছি যদি দেখে কালো আলখাল্লা পরা কোনো মানুষ ছুটে বের হয়ে যায় তাকে ধরে ফেলতে হবে। মানুষটার হয় অনেক লম্বা লম্বা চুল দাড়ি থাকবে, না হলে একেবারে চাঁচাছোলা হবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, লোকটা পালাতে পারবে না।"

ছোটাচ্চু দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "কিন্তু মানুষটার কাছে রিভলবার—"

টুনি মাথা নাড়ল, কোনো সমস্যা নাই। শান্ত ভাইয়ার বন্ধুদের মাঝে দুইজন ব্ল্যাকবেল্ট। রিভলবার চাকু ওদের কাছে কোনো ব্যাপার না।"

ছোটাচ্চুর দুশ্চিন্তা তবু যায় না, বলল, "তারপরও —"

আসলে ছোটাচ্চুর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। গাবড়া বাবা যখন গেট খুলে বের হল, শান্ত আর তার বন্ধুদের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে এই সেই লোক। কালো আলখাল্লা, লাল ব্যাগ, মাথায় একটা চুল নেই, মুখে একটা দাড়ি নেই, কেমন যেন চাঁচাছোলা ভাব। মানুষটার দিকবিদিক জ্ঞান নেই, গেট খুলে প্রাণ নিয়ে ছুটতে থাকে। তাকে ধরার কোনো চেষ্টা না করে শান্ত তাকে ল্যাং মেরে দিল, আর মানুষটা তখন তাল হারিয়ে একেবারে কাটা কলাগাছের মতো আছাড় খেয়ে পড়ল। সেই অবস্থায় লোকটা তার লাল ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে তার রিভলবারটা বের করার চেষ্টা করছিল, তখন ব্ল্যাকবেল্ট নম্বর ওয়ান একটা লাথি দিয়ে তার হাতের বারোটা বাজিয়ে দিল। ঠিক তখন দুই নম্বর ব্ল্যাকবেল্ট পিছন থেকে তার হাতটা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে তার আর নড়ার উপায় থাকল না। অন্যরা তখন ছুটে এসে তার শরীরের নানা জায়গা মাটির সাথে চেপে ধরে তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

শান্তর গলা উঠল সবার উপরে, আর দেখতে দেখতে গাবড়া বাবাকে ঘিরে মানুষের ভিড় জমে গেল। একজন কাছে এসে গাবড়া বাবাকে এক নজর দেখে চিৎকার করে উঠল, "আরে! এটা তো গাল কাটা বকইর‍্যা!"

আরেকজন জিজ্ঞেস করলাম, "সেটা আবার কে?"

"শীর্ষ সন্ত্রাসী। দেওয়ালে বিশজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর পোস্টার দিয়েছে দেখেন নি? ধরতে পারলেই পুরস্কার। এ হচ্ছে তাদের একজন।"

গাল কাটা বকইর‍্যাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে ছোটাচ্চুর আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে পুরস্কারের টাকা দেওয়া হয়েছিল। তনুর মায়ের কাছেও ছোটাচ্চু একটা বিল পাঠিয়েছিল। যত টাকা বিল করেছিল তনুর মা তার দ্বিগুণ টাকার একটা চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলটিমেট ডিটেকটিভ এজেন্সির উপার্জন হিসেবে সেই চেকটার একটা ছবি বড় করে ছোটাচ্চুর ঘরে টানানো আছে।

শান্তর সাথে পাঁচশ টাকার কন্ট্রাক্টের টাকাটা ছোটাচ্চুকে দিতে হয় নি। ঘটনার পরপর তনু নিজের ব্যাগ থেকে সেটা শান্তকে দিয়ে দিয়েছিল। তার শুধু টাকা নয়, সাথে কাছাকাছি ফাস্টফুডের দোকানে নিয়ে তাদের সবাইকে ভরপেট খাইয়ে দিয়েছিল।

টুনি যদিও কথা দিয়েছিল সে আর ছোটাচ্চুকে কোনোদিন জ্বালাতন করবে না কিন্তু তারপরেও আবার কারণে-অকারণে জ্বালাতন করতে শুরু করেছে। ছোটাচ্চু শুধু যে জ্বালাতনটুকু সহ্য করে তা না, মাঝে মাঝে পরামর্শ করার জন্যে টুনিকে নিজে থেকেই ডাকে। বেশিরভাগ সময়েই টুনি না ডেকে টুনটুনি বলে ডাকে।

আজকাল টুনটুনি বলে ডাকলেও টুনি সাড়া দেয়।



মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।